সময় ও সাম্পান

মোশাররফ হোসেন খান

সময় ও সাধন

www.pathagar.com

সময় ও সাগর

মোশাররফ হোসেন খান

আশা

আশা প্রকাশন

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

আশা-৮
সময় ও সাম্পান
মোশাররফ হোসেন খান
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০০
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
প্রকাশক
আশা প্রকাশন
৪৩৫/ক, এ্যালিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রক
আশা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, ঢাকা
গ্রন্থস্বত্ব
মোশাররফ হোসেন খান
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
হামিদুল ইসলাম
মূল্য
পঁয়তাল্লিশ টাকা
SAMAY O SAMPAN
Short stories by Mosharraf Hossain Khan
Published by Asha Prokashon, Dhaka
First print, February 1994
Price : Tk. 45.00

সময় ও সাম্পান মোশাররফ হোসেন খান প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ প্রকাশক আশা প্রকাশন ৪৩৫/ক এ্যালিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ মুদ্রক আশা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স ঢাকা গ্রন্থস্বত্ব মোশাররফ হোসেন খান প্রচ্ছদ ও অলংকরণ হামিদুল ইসলাম মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা
SAMAY O SAMPAN
Short stories by Mosharraf Hossain Khan Published by Asha Prokashon Dhaka First print February 1994 Price Tk. 45.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বাজান
ডাঃ এম. এ. ওয়াজেদ খান
এবং
আম্মা
কুলসুম বেগমকে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

হৃদয় দিয়ে আগুন (কাব্য)
নেচে ওঠা সমুদ্র (কাব্য)
আরাধ্য অরণ্যে (কাব্য)
বিরল বাতাসের টানে (কাব্য)
প্রচ্ছন্ন মানবী (গল্প)

www.pathagar.com

গল্প সূচী

৯ কেবলই ছায়ার শরীর
১৮ ঝরা পাতার শব্দ
২৪ বাঁক ফেরা নদী
৩২ সময় ও সাম্পান
৪১ প্রেম কিংবা পাপ
৫৫ ভাস্কর্যের ভাঁপ
৬৩ টোকা
৬৯ মথিত মাস্তুল
৭৯ পর্বত এবং প্রতিকৃতি
৮৫ দৃশ্যান্তর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কেবলই ছায়ার শরীর

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পাখিরা নীড়ে ফিরছে।

শিপু ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্য ডোবা দেখছে। কি ভেবে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এক পা দু' পা করে গেটের বাইরে এলো। একটি ছেলে শিপুর সামনে এসে দাঁড়ায়। গায়ে তেল চিটচিটে ছেঁড়া জামা। পরনে ততোধিক ছেঁড়া ও ময়লা প্যান্ট। গায়ের রং কালো। কিছুটা হাল্কা গড়ন। বেঁটে।

শিপু ছেলেটির দিকে বার কয়েক তাকালো। কিছুটা উদাসভাবে। ছেলেটি তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়। আবার চেষ্টা করে। এবার গভীর মনোযোগের সাথে ছেলেটিকে দেখে। সে আশ্রয় চায়। শিপুর সম্মতির প্রার্থনা করে অসহায়ভাবে ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে।

শিপু সম্মতি জানায়। ছেলেটি তার পিছে পিছে বাসায় প্রবেশ করে। শিপু জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি?

ছেলেটি বললো, আমাকে খোকা বলেই ডাকবেন।

খোকার বাড়ি কোথায়, ঘর কোথায় তেমন কিছুই জানা হয়নি। জানার তেমন কোনো আগ্রহও শিপুর ছিল না। কি প্রয়োজন? মানুষ-মানুষই। সে যখন যেখানে থাকে, তখন সেটাই তার ঘর হয়ে যায়।

একদিন শিপু ওর মায়ের কথা জানতে চায়। খোকা মা'র কথা বলতে গিয়েও আর বলতে পারলো না। ডুকরে কেঁদে উঠলো। খোকার কান্না শিপু দেখতে পারে না। তার হৃদয়ের অনেক গভীরে খোকার জন্যে একটি কোমল স্নেহ দিনে দিনে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। শিপু বললো থাক, তোকে আর বলতে হবে না। খোকা চুপ হয়ে যায়।

শিপু বোঝে, মানুষের সব কথা জানা যায় না। সব কষ্ট বোঝানো যায় না। কেবল অনুভব করা যায়।

খোকার চারকুলে কেউ নেই। শিপুরও নেই। সত্যিকার আপন বলতে তার কে আছে? শিপু চোখ বন্ধ করে দেখে-একটি অসীম শূন্যতার মধ্যে তার বসবাস। সে জানে না তার মায়ের কথা। মায়ের চেহারাও তার মনে পড়ে না। এত দীর্ঘদিনের সামান্য স্মৃতি ধূসরতায় ম্লান হয়ে গেছে। অস্পষ্ট ছায়া হয়ে গেছে। ছায়াতো আর মা নয়। মা দেখতে কেমন ছিলেন? সে কি আদৌ তাকে মা বলে কোনোদিন ডেকেছিল? না,

www.pathagar.com

তাও মনে পড়ে না। সে কেবল কিছুদিন বাবাকে দেখেছে। বাবার চেহারাটা তার ভাসা ভাসা মনে পড়ে। কিন্তু বাবাকেও তার সম্পূর্ণ জানা হয়নি।

কোনো মানুষকে কি সম্পূর্ণ জানা যায়? নাকি সম্ভব? শিপু অতসব ভাবতে পারে না। ভাবতে জানে না। শুধু জানে, বর্তমানে তার কাছে চরম সত্য খোকা। খোকার অস্তিত্ব।

খুব ছোটকালে শিপুকে নিয়ে বাবা ছাদে বসতেন। আকাশ দেখিয়ে বলতেন– দেখ মা, কি নির্মল আকাশ! জোছনার কুচি ঝরে ঝরে পড়ছে। নক্ষত্রের চোখে লাফায় নতুন স্বপ্ন। মাঝে মাঝে শিপুকে বুকে জড়িয়ে বাবা হু হু করে কেঁদে উঠতেন। শিপু কিছু বুঝতো না। কিছু জানতো না। কেবল বিষণ্ন হয়ে বাবার অশ্রুসিক্ত চোখের ভেতর হারিয়ে যেত। বাবার হৃদয়ে কিসের এত কষ্ট? কিসের এত যন্ত্রণা? শিপু জানে না।

এক রাতে ছাদের ওপর বসে বাবার কাছে মায়ের কথা জানতে চায় শিপু। বাবা প্রশ্ন এড়িয়ে কি যেন লুকোবার জন্যে পাশ কেটে বলেন, আজকের আকাশে অনেক মেঘ। চলো মা ঘরে যাই। শিপু ঘরে আসে।

কিন্তু সুযোগ পেলেই এখনো সে ছাদে যায়। একাকী ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। ছাদে উঠলে শিপু আনমনা হয়ে যায়। তখন আর সে তার ভেতর থাকে না। ছাদে থাকে না। উদাসভাবে চলে যায় অন্য কোথাও। বাতাসের সাথে বাষ্প হয়ে উড়তে থাকে বিষণ্ন সমুদ্রের ওপর। উড়তে উড়তে এক সময় হারিয়ে যায় মেঘের মধ্যে। মেঘ থেকে আবার বৃষ্টি হয়ে হারিয়ে যায় অনন্তে। হারিয়ে যায় অদৃশ্যে।

হারিয়ে যাওয়া অভ্যাসে একবার কাউকে পেয়ে বসলে সে কি আর ঘর চেনে? শিপু জানে না, ছাদ তাকে এত কাছে ডাকে কেন? হারিয়ে যেতে তার এত ভালো লাগে কেন?

গভীর রাত। জোছনারা লাফিয়ে পড়ছে পৃথিবীতে। শিরশির ঠান্ডা হাওয়া। ছাদের ওপর শিপু একলা। সত্যিই কি সে একলা ছিল? কোনো মানুষ কি কখনো একলা থাকে? আসলে শিপু ছাদে ছিল না। একাকী ছিল না। ছিল অনেক ধূসর স্মৃতির মরা খোলসে আবৃত। ছিল অন্য কোনোখানে। অদৃশ্যে।

চুলের খোঁপায় আলতো টান পড়ে। শিপুর দূরগামী অস্তিত্ব ছাদে ফিরে আসে। পেছনে তাকায়।

ও খোকা!

তুমি ছাদে আর আমি তোমাকে এ ঘর ও ঘর খুঁজে খুঁজে মরছি।

তাই বুঝি? পাগল ছেলে! চল্ শুতে যাই।

ছাদ থেকে নেমে তারা ঘরে এসে যার যার মতো শুয়ে পড়লো। শিপু ভাবলো

www.pathagar.com

খোকা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল তার চোখে ঘুম নেই। বালিশে মাথা রেখে এপাশ ওপাশ করছে। শিপুর কষ্ট কি খোকার ভেতরও কোনোরকম দোলা দেয়?

ঘুম চোখে খোকা জেগে ওঠে। শিপুর দিকে তার চোখ যায়। শিপুর খাটের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে,

মাথা ধরেছে আপু? কপাল টিপে দেবো?

কি আশ্চর্য! তুই ঘুমাসনি? সত্যিই মাথা ধরেছে। মাথা টিপে দিতে চাস? দে তো! কি যে করি, মোটেই ঘুম আসছে না।

শিপুর কপালে হাত রেখে খোকা ভীষণ আনমনা হয়ে যায়। তার মনে পড়ে–মা আমার, চির দুখিনী মা, মৃত্যুর আগে ঠিক এভাবেই ছটফট করছিল। খোকা মা'র কপালে হাত রেখে কাঁদছিল। মা বললো, কাঁদিসনে খোকা, দেখিস আবার আমি ভালো হয়ে যাবো।

মা কোনোদিন আর ভালো হয়ে উঠবে না। কোনোদিন আর আমাকে ডাকবে না–খোকা, কাছে আয়। মা–তো চলে গেছে আমাকে ফেলে সেই কবে, পরপারে। কোনো দিনও আর বলবে না–খোকা, ইস্ সারাদিন না খেয়ে আছিস। আয়, খেয়ে নে।

তারপর এই হাত দিয়ে যাকে ডেকেছি, সেই দূরে চলে গেছে। এ হাত বড় অলুক্ষণে। খোকার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মুহূর্তেই শিপুর কপাল থেকে খোকা তার হাত উঠিয়ে নেয়। শিপু অনুযোগের সাথে বলে,

কিরে, হাত তুলে নিলি কেন? দে না, মাথাটা একটু টিপে দে।

তোমার কপাল আপু রানীর কপাল। আমার এ হাত তোমার কপালে রাখা ঠিক হবে না।

শিপু হেসে ওঠে। কথা একখান বলেছিস বটে। রানীর কপাল! শিপু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খোকাকে বলে, ওসব বাজে কথা রাখ। দে, ভালো করে টিপে দে।

খোকা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তার হৃদয়ে ভয় এবং সন্দেহের ঢেউ আছড়ে পড়ে। দু' কূল ছাপিয়ে যায়। কূলের চাতাল ভেঙে পড়ে। খোকা বিষণ্ন এবং ক্লান্ত স্বরে বললো,

এবার ঘুমাও আপু, রাততো পয়ে গেল।

'পয়ে' আবার কিরে?

ঐ হলো আর কি, রাত শেষ হয়ে গেল।

শিপু কষ্টের মধ্যেও না হেসে পারে না। এখনো তোর গ্রামের টান গেল না খোকা?

কি করে যাবে বলো? সেখানেই তো বড় হয়েছি। গ্রামের মধ্যেই যে আমার বর্তমান এবং অতীতকে ভালো করে খুঁজে পাই! গ্রামের মানুষ, বাতাস, কাদা মাটি, ফসলের ক্ষেত যে এখনো আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে ! সে সব ভুলি কেমন করে বলো?

www.pathagar.com

নে, খুব হয়েছে। এবার ঘুমুতে যা।

তুমি না ঘুমুলে আমারও যে ঘুম আসে না আপু!

খোকার কথায় শিপু স্তম্ভিত হয়ে যায়। খোকা তাকে এত ভালোবাসে!

খোকা তার বিছানায় চলে আসে। ঘুমুতে চেষ্টা করে। শিপুও চেষ্টা করছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। এক সময় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তন্দ্রার ভেতর মানুষ সত্যের কাছে যায়। কোনোরকম আবেগ এবং প্রহসন সেখানে থাকে না। শিপুও তন্দ্রার মধ্যে সত্যের মুখোমুখি হয়। সেই সত্যের মধ্যে সে ডাক্তারের কথা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বাবার কথা। তার অসুখ আর ভালো হবার নয়। আমার কি অসুখ? মৃত্যু আর কত দূর? শিপু জানে না। কেনোনা সেটা সত্য হলেও আয়ত্তের বাইরে। শুধু বোঝে তার চারপাশে কেউ নেই। বিশাল পৃথিবীতে সে বড় একা, নিঃসঙ্গ।

তন্দ্রার ভেতর চরম নিঃসঙ্গতা এবং হতাশার লোনাজলে শিপু হাবুডুবু খায়। আতংকে শিউরে ওঠে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়।। অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলোর ঝলকানিতে তার চারপাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। সে শুনতে পায় দূরাগত ঘোড়ার খুরের ধ্বনি। শিপু সচকিত হয়ে ওঠে। বাইরে তাকায়। সে দেখতে পায় দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে স্বাস্থ্যবান ঘোড়ার পিঠে এক নওজোয়ান। ঝলমলে রেশমী পোশাক। শিপু বিস্মিত হয়। জোয়ানটি ঘোড়া থেকে রাজপুত্রের মতো নেমে-তাদের বাসার ভেতর প্রবেশ করছে।

শিপু খাটে শুয়ে আছে। জোয়ান তার খাটের কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে আস্তে করে ডাক দেয় ,

শিপু! ওঠো রানী।

শিপু ঘাড় ঘুরিয়ে জোয়ানকে দেখলো। চোখ মুছে জিজ্ঞেস করলো,

কে?

আমি।

ও, খোকা!

আনন্দে শিপুর চোখ ছল ছল করে উঠলো। শিপুর চারপাশে খোকা ছাড়া আর কেউ নেই। পৃথিবীতে যেন তারা দু'জনই মাত্র মানব-মানবী, আদম আর হাওয়া। শিপু বললো ,

চল্ খোকা, আমরা দূরে চলে যাই। বহুদূরে।

কোথায়?

অনেক দূরে। নতুন জায়গায়। সেখানে নতুন নতুন ফলবান বৃক্ষের নিচে আমরা বসতবাড়ি গড়ে তুলবো। তুই হবি প্রথম মানব আর আমি হবো প্রথম মানবী। আমরা

www.pathagar.com

দু' জনে মিলে নতুন পৃথিবী নির্মাণ করবো। সেখানে গাছে গাছে ফল থাকবে। পাখি থাকবে। নদী থাকবে। বন থাকবে। তুই বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনবি, আমি নতুন চুলায় তোকে রেঁধে খাওয়াবো। আমরা ফসল ফলাবো। মানুষ জন্ম দেবো। নতুন করে প্রেম আর ভালোবাসার সংজ্ঞা রচনা করবো। বনের কাঠ জ্বালিয়ে, আগুন বানিয়ে সেই দাউ দাউ আগুনের তাপে সেঁকে আমরা পরস্পরকে শুদ্ধ করে নেব। চল্ খোকা, চল্। আমরা দূরে, বহু দূরে চলে যাই।

খোকা যাবার জন্যে প্রস্তুত। সে ঘোড়া খুঁজতে বার হয়। ঘোড়াটি হারিয়ে গেছে। খোকা তাকে আর খুঁজে পায় না। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় খোকাও অদৃশ্যে হারিয়ে যায়। মাস যায়। বছর যায়। অনন্ত যুগ ধরে শিপু প্রতীক্ষায় থাকে। খোকা আর ফিরে আসে না। শিপু আবার বিষণ্ন হয়ে যায়। আবার সে হতাশার লোনাজলে ডুবে যেতে থাকে। নিঃসঙ্গতার গভীর অতলে নেমে যেতে থাকে। নামতে নামতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে,

আহ্ খোকা, তুই-ও আমাকে ছেড়ে গেলি? এ পৃথিবীতে আমি যে বড় একা হয়ে গেলাম খোকা!

শিপুর দীর্ঘশ্বাসে খোকা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। শিপুর কান্নার শব্দে সে আতংকিত হয়। ওর খাটের কাছে ছুটে আসে।

কাঁদছো কেন আপু?

শিপু চোখ খোলে। খোকাকে কাছে দেখে আশ্বস্ত হয়। খোকার হাত ধরে বলে, আয়, আরও কাছে আয় খোকা! আরও কাছে।

বারে, সকাল হয়ে গেছে না! লেখাপড়া আছে তো।

থাক, আমিই তোকে পড়াবো। তোকে অনেক বড় করে তুলবো। তুই শুধু কথা দে, আমার কাছে থাকবি। আমাকে ছেড়ে তুই কোথাও যাবি না!

খোকা কিছুই না বুঝে বলে, ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি ছাড়া আমার আর কেইবা আছে!

তাই যেন হয় খোকা, তাই যেন হয়। শিপু খোকার ডান হাতটা নিয়ে তার বুকের ওপর চেপে ধরে। চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলে,

খোকা, রাজপুত্র আমার-প্রথম পুরুষ। প্রথম মানব। তোকে এই আমি প্রথম মানবী স্পর্শ করলাম। তুই কেবল আমার হয়ে থাকিস। তুই সত্যি হয়ে বেঁচে থাকিস খোকা!

খোকার পা যেন অনড় পাথর। শিপুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। শিপুর অশ্রুভেজা চোখের ভেতর খোকা নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই সুখকর হারানোর মধ্যে সে একটা গভীর তাপ অনুভব করে। দেহের শিরাগুলি অনাকাংখিতভাবে টানটান হয়ে যায়। তার শরীর শিউরে ওঠে। খোকা দ্রুত তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো,

www.pathagar.com

তুমি উঠবে না আপু?

খোকার দিকে রহস্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শিপু। ওর চোখ থেকে যেন আগুনের শিখা ছিটকে পড়ছে। খোকা সে আগুনে পুড়তে থাকে। শিপু হাসে। তার বুকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মোচড় দিয়ে ওঠে। দুলে দুলে তরঙ্গ তোলে। খোকা হতবাক হয়ে যায়। শিপু খাটের ওপর বসে তন্দ্রার ভেতর ঘটে যাওয়া দৃশ্যের কথা মনে করে। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে। খোকাকে বলে, বড় হলে তুই আবার আমাকে ছেড়ে যাবি না তো খোকা?

কোথায় যাবো?

বারে, অন্য মেয়ে মানুষের সাথে! দূরে, বহু দূরে। অন্য কোথাও?

খোকা লজ্জা এবং সন্তাপে লাল হয়ে যায়।

একদিন চরম হতাশা আর দুর্ভাগ্যের গ্লানি নিয়ে খোকা শিপুদের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। তরপর নিঃসঙ্গ বুকে পাথরচাপা দীর্ঘশ্বাসে কাটিয়ে দিয়েছে দশটি বছর। পথে পথে। ঘরহীন ঠিকানাহীন ছিন্নমূল খোকা তবু শিপুর স্মৃতি বহন করে চলেছে। সে জানে না এ যাত্রার শেষ কোথায়?

দশ বছর পর নিয়তিই খোকাকে টেনে আনলো সেই পোড়ো, শূন্য বাড়ির দিকে। হৃদয় যেখানে পড়ে থাকে, সেখানে তো অবচেতনেই ছুটে আসতে হয়।

খোকা বার দরোজায় দশ বছর পূর্বের মতো অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। শূন্য বাড়িটি তার দিকে তাকিয়ে যেন উপহাস করে। খোকা জানে, একবার যে চলে যায় সে আর কখনো ফিরে আসে না। তবু কেন এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহর গোনা? তবু কেন প্রতীক্ষায় থাকা? খোকা জানে না। সে গভীর প্রতীক্ষায় থাকে, শিপু তার পায়ের শব্দে জেগে উঠবে। তার শরীরের গন্ধ পেয়ে ছুটে আসবে। কাছে ডাকবে।

কিন্তু শিপু আসে না। ডাকে না আর তাকে। দিন যায়। বছর যায়। কাল ও যুগের পিঠে জমে ওঠে কঠিন আস্তরণ। খোকা প্রতীক্ষায় থাকে। শিপু আসে না।

খোকার দুর্বল শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে যায়। চোখে ঘুম নামে। ঘুমের মধ্যে খোকা সত্যের কাছে চলে যায়। তারপর রহস্যের স্তর পার হয়ে চলে যায় শিপুর ঘরে।

শিপুর খাটটি সেভাবেই আছে। খোকা শিপুর খাটের দিকে যায়। আরশুলারা উপহাস করে। মাকড়সার জালে চোখ আটকে যায়। দু' হাতে লজ্জা সরিয়ে খোকা শিপুর কপালে হাত রাখে। তার হাত কাঁপে। বুকের ভেতর দুরু দুরু করে। শিপু রানীর

www.pathagar.com

পোশাকে শুয়ে আছে। গভীর ঘুমে মগ্ন। খোকা আস্তে করে ডাক দেয়, শিপু!

খোকার ডাকে সমুদ্রের নীলাভ জলরাশি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে যায়। মাঝখানে তৈরি হয় প্রশস্ত বিরাট কংক্রিটের রাস্তা। সে রাস্তা দিয়ে শত শত ঘোড় সওয়ার সমুদ্র পার হয়। পেছনে ফেলে যায় তারা যুদ্ধ, পোড়া ঘরবাড়ি, জীবনের অশেষ গ্লানি। তারা এপার এসে নতুন বসতি গড়ে। সবজির চাষ করে। ফসল ফলায়। ফলের গাছ লাগায়। ফল ধরে। ফুল ফোটে। পাখির ডাকে জেগে ওঠে নতুন সমুদ্র উপকূলবাসী। কেবল জাগে না খোকার আপনজন-শিপু। খোকা আবার ডাক দেয়, শিপু!

খোকার ডাকে শিপু এবার আড়মোড়া ভেঙে সমুদ্রের গভীর থেকে জেগে ওঠে। চোখ খোলে। চোখ খুলেই সে দেখতে পায় খোকাকে। অকস্মাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে-খোকা!

মুহূর্তেই শিপুর চেহারা পাল্টে যায়। কঠিন ধমকের সাথে বলে, এতদিন কোথায় ছিলিরে নিমকহারাম!

খোকা কেঁদে ফেলে। দাও, গাল দাও। যত খুশি গাল দাও। গাল দেওয়া সহজ। কিন্তু ভালোবাসা বড় কঠিন। ভালোবাসায় যে অনেক দায়িত্ব!

শিপু আবার নারীর মতো কোমল স্বভাবে চলে যায়। মোমের মতো গলে যায়। খোকাকে কাছে ডাকে-আয়, কাছে আয়। আরও কাছে। তারপর অনুযোগের সাথে বলে, তুই কেন আমাকে সম্পূর্ণ হতে দিলিনে খোকা!

খোকা অনুচ্চকণ্ঠে বলে, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি শিপু! ভালোবাসার মধ্যে 'সম্পূর্ণ' বলতে কিছু নেই। এটা যে অনিঃশেষ!

আনন্দে শিপুর চোখ চিকচিক করে ওঠে। 'ভালোবাসার' কথা শুনে তার হৃদয়ে ঝড় বয়ে যায়।

খোকা! তুই আমার নাম ধরে ডাকলি! একবার, আর একবার আমাকে শিপু বলে ডাক না, খোকা! তুই আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসিস? উহু, আমার কি যে ভালো লাগছে! এই তো তুই বড় হয়ে গেছিসরে খোকা! আমি জানতাম, তুই একদিন বড় হবি, সত্য পুরুষ হবি।

তুমিও সত্যি হও শিপু! চলো আমরা এখান থেকে দূরে চলে যাই। বহু দূরে। আমি হবো প্রথম মানব আর তুমি হবে প্রথম মানবী।

শিপু কাঁদোস্বরে বলে, আমি যে শেষ হয়ে গেছি খোকা!

খোকা দৃঢ়তার সাথে বলে-আমি তোমাকে আবার জাগিয়ে তুলবো শিপু! আগুনে সেঁকে তোমাকে শুদ্ধ করে নেব।

পারবি তুই?

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই পারবো।

কিভাবে?

আমার পবিত্র প্রেম দিয়ে!

কিন্তু আমি যে তলিয়ে যাচ্ছি!

কোথায়?

সমুদ্রের অতল দেশে! অনন্তে! অদৃশ্যের চোরাবালিতে!

না।তোমকে তলিয়ে যেতে দেব না শিপু। আমার ভালোবাসার সাম্পানে তোমাকে তুলে নেব। সমুদ্রের বুকে জেগে থাকবো কেবল তুমি আর আমি। দু'জন প্রথম মানব আর মানবী।

সত্যি বলছিস খোকা? তাহলে আমাকে স্পর্শ কর। আয়, আমরা আদম-হাওয়া হয়ে যাই। কই, আমাকে স্পর্শ কর!

শিপুকে স্পর্শ করার জন্যে খোকা এগিয়ে যায়। দ্রুত। খোকা যত সামনে যায়, শিপুও ততো দূরে সরে যায়। দূরে। আরও দূরে। খোকা দৌড়ে তাকে ধরতে যায়। শিপু দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে বসে। ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছোটে। ঘোড়ার খুরের ধ্বনিতে চারপাশ কেঁপে কেঁপে ওঠে। ধূলোয় খোকার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। খোকাও অলৌকিকভাবে একটি ঘোড়া পেয়ে যায়। সামনে শিপুর ঘোড়া। পেছনে খোকার। দু'টো ঘোড়াই ছুটছে হাওয়ার গতিতে। ক্রমাগত ছুটছে। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনিতে জনপদ আতংকিত। তবু তারা থামে না। পেছনে পড়ে থাকে নগর, গ্রাম, মরুভূমি, মরুদ্যান, পাহাড়, সমুদ্র এবং বনাঞ্চল। খোকার ঘোড়া আরও দ্রুতগামী হয়। এই তো, আর একটু। আর একটু হলেই শিপুকে স্পর্শ করা যায়।

খোকার ঘোড়া শিপুকে ছুঁই ছুঁই। হঠাৎ শিপু বিদ্যুতের ওপর সওয়ার হয়ে অদৃশ্য বাষ্পের ভেতর দিয়ে উড়ে গেল। দ্রুত। দূরে। বহুদূরে। অদৃশ্যে।

খোকা ভগ্ন হৃদয়ে আশাহত হয়ে পেছন থেকে ডাক দেয়। শিপু! ....

শিপু উত্তর দেয়। আয়, আরও কাছে আয়। মেঘের আস্তরণ ভেদ করে, বাতাসের পর্দা ফাঁক করে, মহাশূন্যের দরোজা পেরিয়ে চলে আয়। আয় না! এতটুকুতে ক্লান্ত হলে চলবে কেন খোকা? ভালোবাসার যে অসীম টান! ভালোবাসায় যে অনেক মূল্য দিতে হয়!

ক্লান্ত খোকা আর ছুটতে পারে না। উত্তপ্ত মরুভূমির ওপর শুয়ে পড়ে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে যায়। পানি পানি বলে সে চিৎকার করে।

শিপু অলৌকিক ঝরনা থেকে আঁচল ভিজিয়ে পানি নিয়ে আসে। খোকার মুখে আঁচল মুচড়িয়ে পানি দেয়। ঝর ঝর করে আঁচল থেকে পানি পড়ে। খোকা পানি পেয়ে সজীব হয়ে ওঠে। চোখ মেলে তাকায়। হাত বাড়িয়ে ডাক দেয়, শিপু!.....

www.pathagar.com

শিপু খিল খিল করে হেসে ওঠে। আবার দূরে সরে যায়। তার অস্তিত্ব মরুভূমির বালির মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। বালির কণার মধ্যে শব্দ ভাসে। শিপুর কণ্ঠ, পারলিনাতো, স্পর্শ করতে পারলিনাতো প্রথম মানব!

খোকা ডাক দেয়, ফিরে এসো শিপু। ফিরে এসো। আমরা নতুন পৃথিবী গড়বো। আগুনে সেঁকে শুদ্ধ হবো। তুমি কেবল সত্যি হও প্রথম মানবী! তুমি কেবল সত্যি হও ছায়ার শরীর!

খোকার কানে আর কোনো প্রতিধ্বনি বাজে না। কেবল ক্লান্ত চোখে দেখে, এক মুঠো লু হাওয়া কুন্ডলী পাকিয়ে মরুভূমির বুক থেকে কেবলই উঠে যাচ্ছে অসীম শূন্যের দিকে।

নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, সেপ্টেম্বর ১৯৯১

www.pathagar.com

ঝরা পাতার শব্দ

রাত বাড়তে থাকে।

জোছনার আলোতে চারদিক আলোকিত। মোড়ল বাড়ির পশ্চিম পাশে পুকুর ঘাট। ঘাটের পাড়ে আম আর নারকেল গাছ। গভীর রাতে মাঝে মাঝে পুকুরে একরকম ভৌতিক শব্দ হয়। মনে হয় কেউ যেন গোছল করছে। গা ছম ছম করা এক ধরনের ভয় করিম সাহেবের শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।

বাড়ির পেছন বারান্দায় করিম সাহেব শুয়ে আছেন। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ছাড়াও নানাবিধ রোগে তিনি ভুগছেন। বয়স বেশি হলে অবশ্য সবাই কোনো না কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। কিন্তু করিম সাহেবের অসুস্থতার মাত্রাটা একটু বেশি। সারা বছরই এটা ওটা লেগেই থাকে।

রাতে তার প্রায়ই ঘুম হয়না। নিদ্রাহীন চোখে তিনি হাজারো স্মৃতির ভিড়ে তলিয়ে যেতে থাকেন।

বাড়ির পূব পাশে বিরাট খোলা মাঠ। মাঠের বামপাশে একটি ছোট বিল। বিলে প্রচুর পরিমাণে আমন ধান হয়। বর্ষা কালে মাছও পাওয়া যায়।

করিম সাহেব পেছনের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে জোছনা রাতে পুকুর, মাঠ এবং বিলের সবটাই পরিষ্কার দেখতে পান। এই ভরা পূর্ণিমায় মাঠের আল্ পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় শিয়াল কিংবা খরগোশ হেঁটে গেলেও। তিনি নিদ্রাহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন মাঠের দিকে।

পুকুরে কেউ যেন গোছল শেষে কাপড় থাবা দিচ্ছে। এত রাতে তো কারুর গোছল করার কথা নয়!

করিম সাহেব বালিশের ওপর নিজের মাথাটা জোরে চেপে ধরলেন। ওপরের কানের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে তিনি গোছলের শব্দ শোনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলেন। তবুও শব্দটি ধিমেতালে এসে তার কানে প্রবেশ করছে। তিনি এবার তার দৃষ্টি এবং মনোযোগ মাঠের দিকে স্থির করে রাখলেন। বারান্দা থেকে পূবের মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। জোছনা রাতে সবই কেমন রূপোর টাকার মতো চকচক করছে।

বড় রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল বৃটিশ আমলে। এই রাস্তা দিয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে এক

www.pathagar.com

সময় ছুটে আসতো অত্যাচারী নীলকর। আসতো খাজনা আদায়ের জন্যে বেপরোয়া জমিদার। তাদের হাতে চাবুক থাকতো। সঙ্গী সাথীদের হাতে থাকতো শেকল এবং মোটা রশি। তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দে গ্রামবাসীরা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতো। সেসব অত্যাচারের দৃশ্য করিম সাহেব নিজের চোখে কিছু দেখেছেন। যা দেখেছেন–তার চেয়েও বেশি শুনেছেন পিতার কাছে। এখনও মাঝে মাঝে সেসব বীভৎস দৃশ্য তার চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে।

রাতে করিম সাহেব একাকী জেগে থাকেন। শুয়ে শুয়ে ভাবেন। পেছনের হারানো স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব স্মৃতির কোনোটা আনন্দের। আবার কোনোটা এতই বেদনার যে তিনি এখনও মনে করে শিউরে ওঠেন।

করিম সাহেব পাঁচদিন হলো–রক্তআমাশয়ে ভুগছেন। ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না। শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই সাথে মনের জোর এবং সাহসও কমে গেছে। শরীরের সাথে মনের সম্পর্ক নিবিড়। একটার অভাবে আর একটা চলতে পারে না।

তার মনে পড়লো–পিতা রহিম বক্সও ঠিক এই রক্ত আমাশয়ে ভুগে মারা গিয়েছিলেন। মরবার সময় তার গায়ে মাংস পর্যন্ত ছিল না। কংকালসার লোকটি এমনি জোছনাপ্লাবিত রাতে অসম্ভব কষ্ট পেয়ে বিদায় নিয়েছিলেন।

করিম সাহেব তার পিতার মৃত্যুর করুণ দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে দেখেন। তিনি নিজের শরীরের চামড়া এবং মাংস টেনে টেনে পরীক্ষা করেন। দেহটি কেমন যেন ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। তিনি মনে করবার চেষ্টা করেন– আব্বা যেন কত বছরে মারা গিয়েছিলেন! সম্ভবত ষাট। আমার তো আটান্ন চলছে!

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলেন। কিন্তু মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি পেলেন না। আসলে মৃত্যু ভয়–এমন একটা ভয়–যা সমস্ত আনন্দ স্বপ্ন এবং বেদনা–বিষাদকেও অতিক্রম করে যায়।

করিম সাহেব ভয় পান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাঠের দিকে তাকান। দেখেন–পূব মাঠের খেজুর বাগান থেকে একটি আলো বার হয়ে তাদের বাড়ির দিকে আসছে। ধীরে ধীরে। শ্লথ গতিতে। তিনি রাতে এ ধরনের আলোকে মাঠে চলাফেরা করতে দেখেন। দেখেন–আলোগুলো বিলের দিকে যায়। তারপর তারা সারা বিল জুড়ে দীর্ঘক্ষণ ছুটোছুটি করে।

কিন্তু আজকের আলোটি তাদের বাড়ির দিকে আসছে কেন?

করিম সাহেব ঘাবড়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করেন।

চোখ বন্ধ অবস্থায় তিনি শুনতে পান–উঠোন দিয়ে কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ। বেশ ভারি। তিনি চোখ না মেলেই অভ্যাসবশত জিজ্ঞেস করলেন, কে কে যায়?

www.pathagar.com

কেউ জবাব দিল না।

কারুর কোনো গলার আওয়াজ না পেয়ে তিনি চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, দিনকাল যা পড়েছে! চোর-ডাকাত কেউ নয়তো? তিনি সাহস করে চোখ খুললেন।

না। কেউ নেই।

তবে যেন কেমন একটা থমথমে আওয়াজ সারা উঠোনে পায়চারি করছে। করিম সাহেব কি করবেন-ভাবতে পারছেন না। তিনি রীতিমত ঘেমে উঠেছেন। কোনো রকম আড়ষ্টস্বরে ডাকলেন- খোকনের মা.....

কুলসুম বেগমের বয়সও পঞ্চাশের কাছাকাছি। করিম সাহেবের মাথার কাছে তিনি আড়াআড়িভাবে বিছানা পেড়ে শুয়ে থাকেন। তার ঘুম খুবই ঘন-গভীর। রাতে জেগে থাকার অভ্যাস নেই। তবে ইদানিং স্বামীর প্রয়োজনেই তাকে রাতে একাধিকবার ঘুম থেকে জাগতে হয়। ওষুধ-পথ্য কিংবা পানি-পান এগিয়ে দিতে হয়। এজন্যে রাতে সতর্ক থাকারও চেষ্টা করেন।

করিম সাহেবের ডাকে কুলসুম বেগম জেগে উঠলেন। বললেন-কি হয়েছে? ঘুমান নি? কোনো কিছু লাগবে?

এইমাত্র ঘটে যাওয়া বিষয়টির কথা বলতে গিয়েও আর বললেন না। বললে কুলসুম বেগমও আর ঘুমুতে পারবেন না। তিনি কিছুক্ষণ-চুপ থেকে বললেন-একটু পানি খাবো।

কুলসুম বেগম উঠে বসলেন। হারিকেনের ফিতা তুলে আলোটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর শিয়রে রাখা জগ থেকে গ্লাসে পানি ভরে তাকে দিয়ে বললেন-পানিটুকু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। রাত তো তো শেষ হয়ে গেল।

কি আর করবো বলো! পোড়া চোখে যে ঘুম আসেনা। তুমি বরং আমাকে একটা পান বানিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

এই শেষ রাতে আর পান খেতে হবে না। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। দেখবেন ঘুম এসে যাবে। এভাবে রাত জাগলে তো শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়বে। -বলে কুলসুম বেগম স্বামীর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন-চোখ বন্ধ করুন তো!

কুলসুম বেগমের সেবা এবং আন্তরিকতায় করিম সাহেব এক ধরনের নির্ভরতা খুঁজে পান। স্ত্রীর ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন-খোকনের মা!

জ্বী।

তোমার কি মনে পড়ে?

কি ! কিসের কথা বলছেন?

সেই যে আব্বার মৃত্যুর দৃশ্য!

www.pathagar.com

কুলসুম বেগম কিছুটা অবাক হলেন। মাঝে মাঝে রাতে করিম সাহেব কিসব দুঃস্বপ্ন দেখেন। ভয়ও পান। তারপর তাকে ডাকেন। আজ আবার ভয় পাননি তো? তিনি জিজ্ঞেস করলেন–হঠাৎ আব্বার মৃত্যুর কথা বলছেন কেন? কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন নাকি?

করিম সাহেব কেমন ধরা গলায় বললেন –না। মানে এমনিই। হঠাৎ করে মনে হলো কিনা! তা, বলোনা–তোমার কি মনে পড়ে?

কুলসুম বেগম অপ্রস্তুত হলেন। তবুও বললেন–কি করে মনে পড়বে? তখন কি আমাদের বিয়ে হয়েছে? আপনিই তো বলেন–তখন আপনার বয়স ছিল পনের বছর।

হ্যা, তাইতো! দেখ আজকাল কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়।

তা এ বয়সে এমন এক আধটু হয়েই থাকে। ওসব কিছু না। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন তো!

করিম সাহেব ঘুমুতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘুম আসেনা। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কান্নারত এন্তাজের চেহারা। তার ছেলে তাকে আজ মেরেছে। ছেলের বউ যা তা বলে গাল দিয়েছে। এন্তাজের চোখের পানি এখনো যেন টুপটাপ ঝরে পড়ছে। একটা অজানা আতংকে করিম সাহেব শিউরে ওঠেন। তিনি বলেন–খোকনের মা!

কুলসুম বেগম ঘুম কাতুরে মানুষ। স্বামীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

করিম সাহেব আবার ডাকলেন–খোকনের মা!

জ্বী। বলে কুলসুম বেগম পুনরায় স্বামীর কথার প্রতি মনোযোগী হলেন। বললেন–ঘুম আসছে না?

না।

কিছু ভাবছেন বুঝি?

ঠিক ভাবনা নয়, দুশ্চিন্তা।

কিসের দুশ্চিন্তা?

তিনি এন্তাজের কথা বললেন। দুপুরে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাটি পাড়ার সবাই জানে। এন্তাজের ছেলেকে এবং ছেলের বউকে সবাই গাল মন্দ করেছে। সামান্য–তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ কি আব্বাকে মারতে পারে? সবাই ছি–ছি করেছে।

কুলসুম বেগম বললেন–ওসব নিয়ে ভাববেন না তো। এন্তাজের ছেলেটাতো মানুষ না। বউটাও তেমন। আমাদের সময়ে দেখেছি বউ–ঝিরা শ্বশুর–শাশুড়ীকে কত শ্রদ্ধা এবং সমীহ করে চলতো। আদবের সাথে তাদের সেবা যত্ন করতো। যুগ পাল্টে গেছে। এখনকার বউরা–তাদের শ্বশুর–শাশুড়ীকে দেখতেই পারে না। সমাজ–সংসারে যেন মুরুব্বীদের কোনো কদর নেই। সম্মানও নেই। একটু একটু

www.pathagar.com

পোলাপানরাও কেমন যেন হয়ে গেছে। তারা আরও বেশি দূরে দূরে থাকতে চায়। দাদা-দাদীদেরকে এড়িয়ে চলতে চায়। তবু কি আর করা যাবে, বলুন! ইচ্ছে করলেই তো আর এসব থেকে আমরা মুক্তি পাবো না। সুতরাং হায়াত আছে যতদিন -ততদিন তো সয়েই যেতে হবে।

করিম সাহেব স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে আরও বিষণ্ন হয়ে গেলেন। কুলসুম বেগমের হাত দু'টো নিজের বুকে চেপে ধরে বললেন-আমারও আশংকা হয়-যদি আমাদের ভাগ্যেও তেমন দুর্দিন আসে! যা দিনকাল পড়েছে! মান-সম্মান নিয়ে মরাও ভাগ্যের ব্যাপার। তুমি-আমিতো এখনো অনেক সচল। নিজের হাতে আমার এবং সংসারের যাবতীয় কাজ করে যাচ্ছো। তবু দেখেছো-বউমা আগে যেমন খোঁজ খবর নিত, এখন আর তেমন নেয় না। শাহাদাতের ছেলে মেয়েগুলোও আর কাছে ঘেঁষতে চায় না। এসব দেখে সত্যি বলতে আমিও অবাক হচ্ছি। এন্তাজের মতো যদি আমরাও কোনোদিন অপমানিত হই?

কি যে বলেন না! যতসব আজে বাজে চিন্তা। শাহাদাত তো আমাদের সবসময় দেখাশুনা করছে। এত অভাবের মধ্যেও সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে-যাতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। শাহাদাতের মতো এমন সোনার টুকরো ছেলে ক'জনের ভাগ্যে জোটে, বলুন! আর ছেলের বউ এবং বাচ্চাদের কথা বাদ দিন। আজ কালকার ছেলে-মেয়েরা একটু আলাদা। কুলসুম বেগম বললেন।

ওটাইতো চিন্তার বিষয়। আমরা কি যুগে জন্মেছিলাম। আর এখন-এ কোন্ অন্ধকার যুগে এসে ঠেকেছি। জানি না-আরও কতকিছু দেখে যেতে হবে। সয়ে যেতে হবে। একসময় কত শালিস, কত বিচার-আচার করেছি। মানুষ শ্রদ্ধার সাথে কথা শুনতো এবং মানতো। আর এখন-এখন আমাদের কথা মূল্যহীন। এমনকি আমাদের উপস্থিতিটাও যেন এদের কাছে অসহ্যের।-বলে করিম সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমাদের যুগ-আর বর্তমান যুগের মধ্যে অনেক পার্থক্য। -বলে কুলসুম বেগম উঠে বসলেন। বললেন- রাত শেষ হতে গেল। এবার চোখ বন্ধ করুন তো। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি শুতে যাচ্ছি। বলে কুলসুম বেগম নিজের বিছানায় চলে গেলেন।

কি সেই পার্থক্য?

করিম সাহেব নিজের কাছেই প্রশ্ন করেন। জবাব পান না। কেবল বুঝতে পারেন-একটা ক্ষয়িষ্ণু পর্বতের চূড়ায় বর্তমান প্রজন্ম কানামাছি খেলছে। তারা ভুলে গেছে, বয়স এবং অর্থ চিরদিনই পরিবর্তনশীল। তারা জানে না, এখন যে বয়সে তারা বয়স্কদেরকে অপমান করছে, অবমূল্যায়ন এবং অশ্রদ্ধা করছে সেই বয়সটি আমরা পেরিয়ে এসেছি। পেরিয়ে এসেছি-কিন্তু অপমানে, ভয়ে আমাদের পিতা-মাতারা কোনোদিন কুঁকড়ে যাননি। দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম তাদের হারাম হয়নি। আমরা-

www.pathagar.com

তেমন প্রাচুর্যের মধ্যে না থাকলেও সুখে ছিলাম। আর এরা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকলেও সুখে নেই। এটাই কি কালের বিচার?

করিম সাহেবের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ভাবেন– কি এক যন্ত্রণাকাতর দুঃসময়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। কি রকম ভয়ংকরভাবে আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

রাত বাড়তে থাকে।

বাড়তে বাড়তে এক সময় শেষের দিকে যায়। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে সজনে গাছের পুরনো পাতাগুলি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লো। বারান্দায় শুয়ে ঝরা পাতার মর্মান্তিক দৃশ্যের দিকে করিম সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। পাতাগুলি ঝরে গেছে। আবার আজ যা পুরনো হবে কাল তা ঝরে যাবে।

করিম সাহেবের কানে ঝরা পাতার মর্মধ্বনি বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছে। তিনি দেখেন–পূব মাঠ থেকে সেই আলোটি হাঁটতে হাঁটতে আবার তাদের বাড়ির দিকে আসছে। করিম সাহেব আর বাইরে তাকাতে পারছেন না। চোখ বন্ধ করে, বালিশের ওপর মাথা চেপে রেখে দু' হাতে কান এটে ধরলেন। তবুও মর্মান্তিক শব্দ এবং দৃশ্যগুলি নিষ্ঠুরভাবে তার কানে প্রবেশ করে তীরের ফলার মতো বিঁধে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন। উঠোন দিয়ে কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে।

থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। করিম সাহেব অবচেতন মনে একটা নির্ভরতা খুঁজে পান। চোখ বন্ধ করেই জিজ্ঞেস করেন–

কে? কে যায়?

পায়ের শব্দটি ভারি এবং গম্ভীর। কোনো জবাব না পেয়ে তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন–

কে, কে যায়?

করিম সাহেবের প্রশ্নের জবাবে একটি খন্‌খনে আওয়াজ খুব মৃদু অথচ ভয়ংকরভাবে ভেসে এলো–

আমি–আমি মৃত্যু।

মাসিক কলম, নভেম্বর ১৯৯২

www.pathagar.com

বাঁক ফেরা নদী

কপোতাক্ষ ঘাটটি এখন প্রায় লোকশূন্য।

একটি মেয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। সম্ভবত লঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার কাঁধে হালকা ধরনের একটি ব্যাগ। পরনে নীল রঙের শাড়ি এবং শাড়ির সাথে ম্যাচ করে হালকা বেগুনি রঙের ব্লাউজ। চুলগুলো ঘন কালো এবং দীর্ঘ। চুল ছেড়ে দেয়া বলে বাতাসে এলোমেলো উড়ছে। গায়ের রং উজ্জ্বল। কিন্তু বেশ হালকা অথচ সুঠামদেহী। মেয়েটির চোখেমুখে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসার ক্লান্তি। লঞ্চঘাটের শিশুতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার বাড়ি থেকে বাঁকড়ার লঞ্চঘাট বিশ মিনিটের পথ। এখান থেকে শেষ লঞ্চটি ঝিকরগাছার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে বেলা দু' টোয়। আমি হাতে কিছুটা সময় নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়েছি।

লঞ্চঘাটে পৌঁছেও হাতে দশ মিনিট সময় অবশিষ্ট আছে। ঘাটে পৌঁছে আমি একটিমাত্র যাত্রীকে দেখলাম। সে-ঐ মেয়েটি।

মঙ্গলবার বাঁকড়ায় বড় বাজার বসে । সুতরাং বেলা দু' টোর লঞ্চে তেমন বেশি যাত্রী হয় না। আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। তার ক্লান্ত-ক্লিষ্ট চেহারার ভেতর দিয়ে এক ধরনের মায়াবী দ্যুতি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সে আমাকে বললো, আপনি কি এই লঞ্চেই যাবেন?

বললাম-হ্যাঁ।

মেয়েটি যেন আশ্বস্ত হলো।

ঠিক বেলা দু' টোয় লঞ্চ ছেড়ে দিল। ইঞ্জিনচালিত নৌকা। এটাই লঞ্চ হিসাবে পরিচিত। বেশি যাত্রী না। মাত্র আট-দশজন। লঞ্চের যাত্রীরা যেহেতু আমার গ্রামের আশ-পাশের, সে কারণে সবাই আমাকে চেনে। তারা আমার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে।

লঞ্চ, নৌকায় কিংবা গাড়িতে উঠলে আমি জানালার ধারে অথবা গলুই-এর মুখের দিকে, ফাঁকা জায়গায় বসতে ভালোবাসি। কারণ, নদী বা সমুদ্র আমার খুব প্রিয়। অথৈ জলের ভেতর যে রহস্য লুকিয়ে থাকে এবং জলের যে তরঙ্গমালা ফুলে ফেঁপে গূঢ় অর্থময়তার সৃষ্টি করে -তার ভেতর থেকে আমি আমার জীবনের ও প্রকৃতির রহস্যকে

www.pathagar.com

বুঝতে চেষ্টা করি। জলের রহস্যময়তায় আমি আনমনা হয়ে যাই। বিস্মিত এবং হতবাক হই সুনিয়ন্ত্রিত ও ক্রমাগত নদীর জোয়ার ভাটা দেখে।

লঞ্চের ভেতর থেকে আমি আমার চেনাজানা নদীর দু' পাশকে দেখছি। ফসলের ক্ষেত দেখছি। চরাপড়া, কোথাও বা শীর্ণকায় স্রোতের আহাজারী শুনছি। এই কপোতাক্ষ, এক সময় কতই না উন্মত্ত যৌবনদীপ্ত ছিল। এখন সে মৃতপ্রায়।

এসব ভাবছি। প্রায় পাঁচ মাইল পথ এসে গেছি। ভাবনার ভেতর আমি অন্য কারুর সাথে কথা বলতে পারিনে। কেনোনা সব ভাবনাই তো আর সবাইকে বোঝানো যায় না।

মেয়েটি বসেছিল একটু ফাঁকা জায়গায়। কখন যে সে আমার কাছাকাছি এসে বসেছে–খেয়াল করিনি। এক সময় তার কণ্ঠের আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, সে একেবার আমার বাম পাশ ঘেঁষে বসে আছে। আমাকে বললো, মাইকেলের বাড়ি তো সাগরদাঁড়িতে। এই কপোতাক্ষর ধারেই। আপনি কি সেখানে গেছেন কোনো দিন? সাগরদাঁড়ি এখান থেকে কতদূর?

বল্লাম, বাঁকড়া থেকে পূর্ব–দক্ষিণ কোণের দিকে প্রায় দশ মাইলের মতো পথ হবে। হ্যাঁ, গিয়েছি কয়েকবার। সেখানে গেলে প্রাণটা একদিকে আনন্দে ভরে যায়, অপর দিকে বেদনায় হাহাকার করে ওঠে।

মেয়েটি আবার প্রশ্ন করলো, কবি ফররুখের বাড়িও তো যশোর?

বললাম–হ্যাঁ।

আসলে যশোর হলো কবি–সাহিত্যিকদের জন্মস্থান। এখানকার মাটি যেন রত্নগর্ভা। বলে মেয়েটি হেসে উঠলো।

আমাদের কথাবার্তা–লঞ্চের অন্যান্য যাত্রীরা হয়তোবা শুনতে পারে। কিংবা নাও পেতে পারে। ইঞ্জিনের ক্রমাগত বিকট শব্দে তাদের কানে আমাদের এই মৃদু কথার ধ্বনি পৌঁছাতে নাও পারে। তবু আমরা যে গল্প করছি এবং মেয়েটি যে আমার একেবারেই কাছে–এটা ভেবে সত্যি বলতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মেয়েটিকে আবার কিছু বলাও সম্ভব হচ্ছিল না। মেয়েটি আমার পাশে দীর্ঘক্ষণ বসে আছে। তার শাড়ির আঁচল এবং অবিন্যস্ত চুল উড়ে উড়ে আমার শরীরে আছড়ে পড়ছে। আমি একটু সরে বসলাম। নৌকার গলুই–এর কাছাকাছি। মেয়েটিও আমার সাথে সাথে সরে এলো। বললো, আমারও নদী খুব প্রিয়।

আমি মেয়েটির ক্লান্ত শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তবু এই দীর্ঘ দু' ঘন্টার মধ্যেও তাকে জিজ্ঞেস করিনি, সে কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কি তার নাম, কি তার পরিচয়। হয়তোবা ব্যাপারটি অশোভনীয়, তবু আমার এমনটিই হলো। মনে হলো, এই তো সেই মেয়ে, ঘন কালো কোঁকড়ানো দীর্ঘ কেশরাশিতে যাকে অপূর্ব দেখাতো।

www.pathagar.com

ক্ষীণাঙ্গী, অথচ কী রূপ লাবণ্যে ভাস্বর! ঠিক যেন একে বেঁকে চলা আমার প্রিয় নদীটির মতো। অস্ফুটে বললাম তোমার নাম জানার কি প্রয়োজন মেয়ে? তোমাকে তো অনেক চিনি। সেই কবে, হয়তোবা আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেছিলাম তোমাকে। তোমার ঐ মুখোচ্ছবি–যত ম্লানই হোক না কেন প্রকৃতির অভিশাপে, আমার চোখ থেকে তাকে আড়াল করতে পারে কে?

আমি মেয়েটির দিকে একবার তাকালাম।

সে বললো–কি দেখছেন?

বললাম–নদী এবং নদীর রহস্যময়ী সৌন্দর্যকে।

মেয়েটি হাসলো।

দেখলাম, ততোক্ষণে কপোতাক্ষ জোয়ার–যৌবনে ফুলে উঠেছে। এবং আমাদের লঞ্চটি ঝিকরগাছার ঘাটে এসে ভিড়েছে।

দুই

ঝিকরগাছার লঞ্চঘাটে নামার পর মেয়েটি বললো, আমরা সম্ভবত এবার বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছি। আমি তো খুলনা যাবো। আপনি?

আমিও আপনার সাথে কিছুদূর অন্তত যেতে পারবো।

তার মানে?

আমিও খুলনা যাবো।

মেয়েটি হেসে উঠলো। বললো, বেশ হবে। চলুন না এক সাথে যাওয়া যাক!

মিনি বাসে দু'টো সীটে আমরা দু'জন। বাসের অন্য যাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে স্বামী–স্ত্রী বলে ভাবছে। আমার মতো একজন কৃষ্ণকায়, স্বাস্থ্যহীন যুবকের পাশে এরকম সুন্দরী একটি মেয়ে; স্বামী–স্ত্রী হিসাবে বেমানান বলেও হয়তোবা অনেকে ভাবতে পারে। বাসের অনেকের চোখ এ দিকে। তবে আমার দিকে খুব একটা না। সঙ্গত কারণে মেয়েটির দিকেই বেশি।

বাসে উঠে আমি যথারীতি জানালার পাশে বসেছি। মেয়েটি বললো, জানালার পাশে বসে প্রকৃতি দেখতে দেখতে যাওয়া–খুবই চমৎকার। আমারও খুব ভালো লাগে।

তাকে বললাম, আমারও যে এটা অত্যন্ত প্রিয় এবং এ ব্যাপারে আমাকে স্বার্থপর বলতে পারেন।

যশোর–নওয়াপাড়া ছাড়বার পর হঠাৎ বাসটি বিকল হয়ে পড়লো। আমাদেরকে নামিয়ে গাড়ি ঠিক করতে লেগে গেল গাড়ির লোকজন। আমরা পাশের গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছি। মেয়েটি হঠাৎ বললো, এই যে আমরা দীর্ঘক্ষণ এক সাথে আছি,

www.pathagar.com

কথা বলছি, তবুই আপনি তো একবারও আমাকে জানতে চাইলেন না? আশ্চর্য, আপনার মনে কি আমার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জাগেনি? নাকি কোনো উৎসাহ নেই? নাকি আমাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বা উপেক্ষা করার জন্যে এ ধরনের অপমানজনক আচরণ করলেন? কথাগুলো সে এমনভাবে বললো, আমি সত্যিই ব্যথিত এবং লজ্জিত হলাম।

একটু চুপ থেকে বললাম, না, আপনাকে অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, সম্ভবত বহু দূর থেকে আপনি জার্নি করে এসেছেন, আবার যাবেন হয়তোবা অনেক দূর, তাই আপনাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে আর বিব্রত করতে চাইনি। আপনি কিছু মনে নেবেন না।

মেয়েটি কিছুক্ষণের জন্যে চুপ হয়ে গেল। এবং তার চোখের কোণা ছল ছল করে উঠলো।

বললাম–আপনার চোখে পানি?

পানি নয়, এ অভিশাপের আগুন। মেয়েটি জবাব দিল।

অভিশাপের আগুন! তার মানে?

আমি সবিস্ময়ে মেয়েটির চোখের দিকে তাকালাম। কিন্তু তার চোখ থেকে ছিটকে পড়া বারুদের ধোঁয়া ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

তিন

বাস পুনরায় স্টার্ট দিলে আমরা সবাই বাসে উঠে বসলাম। মেয়েটিকে বললাম, এবার আপনি জানালার ধারে বসুন।

আমাকে কৃপা করছেন? মেয়েটি হেসে বললো।

না। প্রকৃতির আনন্দটুকু আমরা ভাগাভাগি করে নিই।

সে হেসে উঠে সম্মতি জানালো।

বাসটি যশোরের সীমানা ছাড়িয়ে খুলনার সীমানায় পড়তেই সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। বললাম, কি হলো?

মেয়েটি বললো, ফেলে এলাম।

কি ফেলে এলেন?

যশোর। একটি সুন্দর শহর, জেলা এবং সেই জেলার একজন মানুষকে।

বললাম, তিনি কে?

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললো, তিনি–একজন কবি। আপনি তাকে চিনবেন না। অথচ, দেখুন, আমার বাবার আমি একমাত্র সন্তান। কত আদরের, তাই না? ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! মেয়েটি আবার বিষণ্ন হয়ে গেল। বাইরে কিছুক্ষণ তাকালো। তারপর খুব নিচুস্বরে বললো, আমি যখন মেট্রিক পরীক্ষা দেব, তার কয়েক

www.pathagar.com

মাস আগে কবি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সাতাত্তর সালের দিকে। কি যে তার ব্যক্তিত্ব! আমরা হিন্দু। তবু তিনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন একদিন। আমার মা তার জন্যে রান্নার সব আয়োজন করে দিয়েছিলেন। আর আমি তাকে সহযোগিতা করেছিলাম। তিনি আমাদের ছায়াঘন চারটি পানের বরজ সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন কোমরপুর এবং বারই পাড়ার অলিগলি। তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। আমরা কবির কোনোরকম অনাদর হতে দেইনি। রাতে তিনি আমার খাতায় একটি চমৎকার কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

মেয়েটি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললো, তারপর আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। তার মৃত্যুর পর আম্মাকে নিয়ে চলে যাই ভারতে। সেখানে আমাদের কিছু আত্মীয় ছিল। পরে আম্মাও মারা যান। আমি তখন একা। ভারত আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা একটি দেশ, দেশের মানুষ। আমার বাংলাদেশে জন্ম। বাংলাদেশের আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা এই আমি। এখানকার কৃষ্টি-কালচার, এখানকার প্রাকৃতিক ও মানবিক আচরণ- ওখানকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বহু চেষ্টা করেও আমি ওখানে নিজেকে মানাতে পারলাম না। ভারত আমাকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ভারত আমাকে সম্মানজনকভাবে সেখানে টিকে থাকতে দেয়নি। যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তাম-তখন সেই খাতাটি বার করে কবির কবিতাটি পড়তাম। পড়তাম আর চোখের পানি ছাড়তাম। আহ্ কবি, যিনি এত ঔদার্যের, এত মানবিক, এত চমৎকার, এত বিশালত্বের বাণী উচ্চারণ করেন, তার হৃদয়ে কি এতটুকুও ঠাঁই অন্তত আমার জন্যে অবশিষ্ট থাকতে পারে না? তিনি কি সামান্য একটি মেয়ের স্থান তার হৃদয়ে দিতে পারেন না? বিশ্বাস করুন-কাঁদতে কাঁদতে আমি কবিকে মাঝে মাঝে গাল দিয়েছি। অবশ্য তার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কারণ, সেদিন-আমিই তার ঠিকানাটি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সে হঠাৎ তার ব্যাগে হাত দিয়ে বললো, আপনি কি তার কবিতাটি দেখবেন? আমার ব্যাগের মধ্যে সেটা এখনো আছে।

বললাম, থাক না। পরে দেখা যাবে।

মেয়েটি ম্লান হাসলো। তাই কি সম্ভব? বাস থেকে নেমেই তো আমরা দু' জন দুই প্রান্তে ছিটকে পড়বো।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। বাইরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম। ব্যর্থ হলাম। কেনোনা, আমার চোখে তখন অসংখ্য হিমশীতল কুয়াশার কুচি এসে চোখ দু' টোকে ঝাপসা-আঁধার করে দিচ্ছিল। অসংখ্য বেদনার ভিড়। স্মৃতি ও কষ্টের তীব্র যন্ত্রণায় আমিও তখন অস্থিরতায় কাঁপছিলাম। তাকে কেমন করে বোঝাই, মেয়ে- তোমার স্মৃতির ভার বইতে না পেরে আমিও তিন বছর পর কোমরপুর গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আমি যখন গেলাম, তখন দেখলাম, কোমরপুর আছে। অসংখ্য পানের বরজ আছে। সুপারি ও নারকেল গাছের বাগান আছে। কেবল শুকিয়ে গেছে তোমাদের সেই খালটি। কেবল নেই তোমাদের বরজ ক'টি। আর নেই তুমি। সেই থেকে তুমি কি জানো মেয়ে, সেই থেকে আজ পর্যন্ত কতটা বেদনার ভার বয়ে বেড়াচ্ছি! এখনো ঘুমিয়ে পড়লে তোমাকেই তো দেখি; পরস্পর হাত ধরে তোমাদের পানের বরজের ভেতর দিয়ে অথবা খালপাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তুমি যেন বলছো; তুমি কত উদার কবি, আকাশের মতো। সূর্যের মতো। আর আমি? সংকীর্ণ-স্রোতহীনা একটি নদীর মতো। তারপর এক সময় প্রচন্ড আক্রোশে বলছো-'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত।'

কি করে ভুলি বলো! সহজে সব কিছু ভুলতে পারলে এতটা কষ্ট-যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হতো না।

সে যেন অস্ফুটে বলে উঠলো, বুঝি গো কবি, বুঝি। তোমার না বলা কথা সবই বুঝি। কিন্তু কেন এই অচেনা-অজানার খেলা? কেন এই মান-অভিমানের তুফানে ভাসা?

চার

খুলনা বাসস্ট্যান্ডে বাস থামলে দু'জনই নেমে পড়লাম। মেয়েটি তার ব্যাগটি ওঠানোর সময় বললো, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। ধন্যবাদ দেব না। কিছু মনে নেবেন না।

বললাম, ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। আমি তো আমার প্রয়োজনে এসেছি। আপনাকে কি বা সহযোগিতা করতে পেরেছি, বলুন!

অনেক করেছেন। সেটা আপনি বুঝবেন না।

কিছুই করিনি। চলুন আপনাকে রূপসা ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়েটি বিস্ময়ের সাথে বললো, আমি রূপসা পার হবো, আপনি তা কিভাবে জানলেন?

বললাম, এটুকু জানা তেমন কষ্টের কিছু না।

মেয়েটি চমৎকার করে হাসলো। বললো, তাই বুঝি! আর কিছু জানেন?

আমি তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললাম, সম্ভবত নৌকা এপারেই আছে। একটু তাড়াতাড়ি গেলে ধরা যেতে পারে।

মেয়েটি কিছুই বললো না। বেশ গম্ভীর হয়ে আমার সাথে সাথে সে হাঁটতে শুরু করলো।

www.pathagar.com

পাঁচ

ওপার থেকে সবেমাত্র যাত্রীবোঝাই নৌকাটি ঘাটে এসে ভিড়লো। সবাই নামছে। কেউ কেউ মালামাল নামাচ্ছে। নৌকা খালি হয়ে গেলে এপারের যাত্রীরা আবার ওঠা শুরু করেছে। মেয়েটির মধ্যে কোনো ব্যস্ততা নেই।

তাকে বললাম, নৌকা তো ছেড়ে দিচ্ছে!

সে এবার আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো, আপনি কি আমার সাথে একটি মাত্র সত্য কথা বলবেন?

আমি চমকে উঠলাম। বললাম–কি?

আপনি কি আমাকে সত্যিই চিনতে পারেন নি? নাকি অসহায় ভেবে আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন?

তা কেন হবে?

তবে? এতটা পথ, এতটা সময় আপনি চিনে, জেনে, বুঝে, আমার সাথে এভাবে অভিনয় করতে পারলেন? অথচ আপনার জন্যে, হ্যা–আপনার জন্যেই হয়তো কবি–

মেয়েটি আর কথাগুলো শেষ করতে পারলো না। তার কণ্ঠনালী যেন কোনো এক দৈবশক্তি চেপে ধরলো। সে সবার সামনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আমি অসহায়ভাবে তাকে বললাম, নৌকা ছেড়ে দিচ্ছে।

মেয়েটি চোখ মুছে হঠাৎ আমার পায়ে দু' হাত রেখে বললো, দূর থেকে আপনাকে অনেক অভিশাপ দিয়েছি কবি, ক্ষমা করে দেবেন। আমি জানি, আপনার মতো ভালো মানুষ তুলনাহীন। আপনি মহৎ। এই যে অসহ্য কষ্ট নিয়ে অপমানিত হয়ে আমি গঙ্গা পার হয়ে এসেছি এবং আপনাকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। পৃথিবীতে আমার চেয়ে আর কে বেশি সুখী, বলুন! আপনার অস্তিত্ব এবং স্মৃতির সুখটুকু বয়ে বাকি জীবনটাকে পার করতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো। পুনরায় চোখ মুছে সে বললো,

হ্যাঁ, এইতো রূপসা পার হতে যাচ্ছি। হয়তোবা পারবো। হয়তোবা নয়।

ছয়

রূপসার পাড়ে আমরা দু' জন–দু' জনের মুখোমুখি।

সূর্যের উজ্জ্বলতা ফিকে হয়ে আসছে। এলোমেলো বাতাসে তার চুল অবিন্যস্ত। সারা শরীরে ক্লান্তি ও ব্যর্থতার ছাপ।

আমার হৃদয়ে সাইপ্রাসের ঝড়। তার বাবা বেঁচে নেই। কোমরপুরে তার আর কেইবা আছে? তবু সে কোন্ ভরসায় গঙ্গা পার হয়ে এলো? এতদিন পরে, কিসের

www.pathagar.com

টানে?

আমার চোখ দু'টো আকাশের দিকে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রূপসার টালমাটাল জলের ঢেউয়ে ডুবন্ত সূর্যের সোনালী আভা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি উদাস হয়ে ছিলাম।

হঠাৎ একটা দমকা-ভা'রি এবং উত্তপ্ত বাতাসের শব্দে চমকে উঠলাম। বাতাস নয়। মেয়েটির ভেতর থেকে উৎক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাস। তার দীর্ঘশ্বাসের বারুদে যেন পৃথিবী পুড়ে যাচ্ছে। আর -তার পাঁজর উপচানো সন্তাপে যেন হিমালয় টালমাটাল।

আমি যখন চোখ তুলে তাকে দেখতে গেলাম, তখন দেখি তার আ-সমুদ্র চাহনীর অতলে ডুবে যাচ্ছি। ক্রমেই ডুবে যাচ্ছি আর সমস্ত পৃথিবী আমার দিকে অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

নৌকা ছাড়তে যাচ্ছে।

মাঝি বৈঠা দিয়ে নৌকার গলুই পূব দিকে ঘুরানোর আগেই আমার ভেতর থেকে একটি চিৎকার ধ্বনি পাথর- প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে এলো। স্বপ্নের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাকলাম,

সাধনা !.....

আমার আওয়াজে সন্ধ্যার আচ্ছাদন চিরে সাধনা সলাজ হাসিতে পরম নির্ভরতার সাথে হাত উঁচু করে ফিরে দাঁড়ালো।

এবং আমার দিকে।

পাক্ষিক পালাবদল, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

www.pathagar.com

সময় ও সাম্পান

আটতলা ভবনের সর্বোচ্চ তলায় আইনুল হকের অফিস।

একটা রুমের ভেতর পাঁচটি টেবিল। অন্য রুমে মাত্র একটি। বড় সাহেবের চেম্বার।

মাথার ওপর দু'টো ফ্যান ক্রমাগত ঘুরছে। তবু আইনুলের ঘাম শুকোচ্ছে না। তার আরো বাতাসের প্রয়োজন। অনেক বেশি বাতাস। বুক শীতল করার মতো আ–সমুদ্র বাতাস চাই আইনুলের।

আইনুল কপালের ঘাম মুছতে মুছতে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। জানালার একটি পাল্লা খুলতেই একজন চিৎকার করে উঠলো,

আরে করেন কি, করেন কি? জানালা বন্ধ করুন।

আইনুলের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে বন্ধ করে না। এবার সে জানালার দু'টো পাল্লাই খুলে ফেললো। বাতাস আসছে। ঝিরঝির গতিতে। খুব ধীরে। আইনুল তার টেবিলে চলে আসে। বেশ ক্লান্ত। চেয়ারে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলের দিকে চোখ দেয়। দু'টো আরশোলা তার টেবিলের ওপর মরে পড়ে আছে। আইনুল একটু অবাক হলো। মানুষের মৃত্যুর মতো পোকা–মাকড়ের মৃত্যুও তাকে ভাবিয়ে তোলে। আচ্ছন্ন করে। কষ্ট দেয়। পারতপক্ষে সে কোনো মৃত্যু সংবাদ কিংবা মৃত জীবকে দেখতে চায় না, মৃত্যুর সংবাদ শুনতেও চায় না। এমনকি যে বৃক্ষের পাতাগুলো ঝরে গেছে, আইনুল সেদিকেও তাকায় না। মৃত্যুর প্রতি যার এত ভয়, যার এত বিতৃষ্ণা, সেই মৃত্যুই তার টেবিলে অসহায়ভাবে পড়ে আছে। আইনুল গভীর মমতায় আরশোলা দু'টোর দিকে তাকিয়ে থাকে। আরশোলার চারপাশে পিঁপড়ের ভীড়। মৃত্যুও কি তাহলে কারুর জন্যে আনন্দ–উল্লাসের উপকরণ! এই যেমন পিঁপড়েদের এখন আনন্দ মিছিল!

আইনুলের মনটা খারাপ হয়ে যায়। এধরনের অনাকাংখিত দৃশ্য দেখার জন্যে সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তার কাছে এ ঘটনার পর আকস্মিকভাবে সবকিছুই রহস্যময় বলে মনে হয়। জীবন, জগৎ এবং এ অফিসও। মৃত্যুর কাছে সবাই কেমন পরাজিত। কথাটির অর্থ খুঁজতে গিয়ে তার জীবনটাই মূল্যহীন বলে সে বিবেচনা করে।

আইনুল কেমন বিষণ্ন হয়ে যায়। সে যেন তার ভেতর নেই। সে যেন অফিস এমনকি পৃথিবীতেও নেই। কেবল ছায়া হয়ে, মেঘ হয়ে, বাতাস হয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে শূন্যে, মহাশূন্যের দরোজা ভেদ করে অদৃশ্যে, অন্তহীন।

www.pathagar.com

একসময় তার মনে হলো, সেও আরশোলার মতো মরে গেছে। তার মৃতদেহ প্যারাসুটের মতো ফুলে-ফেঁপে দ্রুত নিচে নেমে আসছে। আর তার চারপাশ ঘিরে শকুন ও দাঁড়কাক আনন্দ মিছিল করছে। তারা যেন নবান্নের উৎসবে মেতে উঠছে। তার চারপাশে দু'একটি গর্ভবতী কুত্তার লোলুপ দৃষ্টি এবং জিহ্বার লালা ঝরে ঝরে পড়ছে। সে নিজের এবং আরশোলার মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। কেনোনা, হয়তো আরশোলাকে খাবার জন্যেই অন্য কোনো হিংসুটে লোভী-তাদেরকে হত্যা করেছে। আইনুলরা যেভাবে লোভী ও হিংস্র দানবদের পেষণে প্রতিদিন রক্তশূন্য হচ্ছে।

আইনুল ঘেমে ওঠে। তার আরো অনেক বাতাসের প্রয়োজন। ঠান্ডা বাতাস। কিন্তু কোথায় পাবে এতো বাতাস? বেঁচে থাকার জন্যে এখানে আইনুলের জন্যে আর কোনো বাতাস অবশিষ্ট নেই।

দম বন্ধ করা গুমোটের ভেতর আইনুল হাঁপিয়ে ওঠে। একবার চোখ বন্ধ করে শুকনো গলাটা ঢোক গিলে ভেজাতে চেষ্টা করে। চোখ বন্ধ হতেই সে অনুভব করলো, জানালার ফাঁক দিয়ে অসংখ্য দাঁড়কাক ছুটে আসছে হা করে। তাদের চিৎকার ধ্বনিতে আইনুলের বুকটা আরো শুকিয়ে গেলো। দাঁড়কাকেরা তার টেবিল ঘিরে নৃত্য করছে। উপহাস করছে। তারপর তারা টেবিলের ওপর শৃঙ্গার শেষে পালক ঝরিয়ে ডাকতে ডাকতে সবশেষে বিজয় উল্লাসে তার দিকেই ছুটে আসছে।

আইনুল লাঞ্ছনার গ্লানি সহ্য করতে পারে না। তার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে। দাউ দাউ আগুন। দু'হাতে দাঁড়কাকের পালক সরাতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়। পালকের স্তূপে তার শরীর ও মাথা ঢাকা পড়ে যায়। পানি পানি বলে আইনুল চিৎকার করে ওঠে। পিপাসা পেলেই তার সুলতানার কথা মনে পড়ে।

আইনুল অফিসে যাবার পর সুলতানা বিশাল আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। আঁচড়টা খুব বেকায়দা জায়গায় লেগেছে।

আয়নার সামনে সুলতানা বাম পা একটু উঁচু করে জলচৌকির ওপর রেখে আস্তে করে শাড়ি এবং পেটিকোট আলগা করে ধরে। ডিমের কুসুমের মতো গাঢ় উজ্জ্বল রঙের মাঝখানে একটা রক্তাভ আঁচড়। জায়গাটি দিয়ে একধরনের আঠালো কষ বার হচ্ছে। সুলতানা বাম হাতের আঙুল দিয়ে জায়গাটি স্পর্শ করে। আঙুলের স্পর্শে এক ধরনের যন্ত্রণা এবং ঈষৎ শিহরণ- একই সাথে দু'টো অনুভূতির ঝর্নাধারায় সুলতানা দুলতে থাকে। এসময়ে তার আইনুলের কথা মনে পড়লো।

সুলতানা শাড়ি পেটিকোট না নামিয়ে আয়নার সামনে ঘুরে ফিরে দাঁড়ায়। তার ভেতর বিবর্তনের বৃষ্টি ঝরতে থাকে। আয়নায় কখনো আইনুলের মুখ দেখতে পায়।

www.pathagar.com

আবার কখনো বা নিজের। দু'টো ছায়া ক্রমাগত বিবর্তন হতে হতে অবশেষে সুখকর এক অনিবার্য পরিণতি। সুলতানার ভেতর একটা ভয়ানক খেলা কাজ করতে থাকে। সে ভুলে যায় জীবনের ব্যর্থতা, সংসারের শত গ্লানি, জগতের কঠোর অভিশাপ।

সুলতানা আয়নার সম্মুখে আরো স্পষ্টতর হতে চায়। আয়না নয়, যেন আইনুল। সে ভুলে যায় তার আঁচড়ের কথা।

এসময়ে আয়নার গ্লাস ভেদ করে একটি বীভৎস কংকাল তার সামনে এসে দাঁড়ায়। যেন আইনুলের কংকাল। তার শরীরের অস্থি-মাংস খসে গেছে। কংকাল! হাড়ের পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে একটি মানুষের দেহ। কংকালটি হাসছে। হাত-পা নাড়ছে। মাংসশূন্য আঙুল, দাঁত, মুখ, মাথা ও পাঁজরের হাড়ের দিকে তাকিয়ে সুলতানা আর্তনাদ করে উঠলো। সে ভয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। মেঝেতে বসে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় সুলতানা। চোখ বন্ধ হতেই সুলতানা অনুভব করে, সে নিজেও কংকাল হয়ে গেছে। আইনুল এবং সুলতানার কংকাল দু'টো বাতাসের সাথে ভাসতে ভাসতে সারা বাংলাদেশ, এশীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর প্রতিটি অলিতে গলিতে প্রদক্ষিণ করছে। চোখ বন্ধ করে, বাতাসে কান রাখলেই তাদের যাতায়াত, গমনাগমন অনুভব করা যায়।

সুলতানা ভয়ের ভেতর গোঙাতে থাকে। তার শাড়ি-পেটিকোট অবিন্যস্ত। সে দেখতে পায়, তাদের দু'টো কংকাল ঘিরে অসংখ্য শকুন এবং দাঁড়কাকের উল্লাস। তাদের খাটের ওপর শকুনেরা পরস্পর মিলিত হচ্ছে এবং পালক নেড়ে সুখানুভূতি প্রকাশ করছে। সুলতানা আইনুলের কংকাল জাপটে ধরে কম্পিত স্বরে বললো- শকুন, শকুন!

আইনুলও সুলতানার কংকাল বুকে চেপে উত্তর দিল, শুধু শকুন নয়, দাঁড়কাকও আছে। ওদের চেহারা প্রকৃতির অভিশাপে একই রকম হয়ে গেছে। আসলে রক্ত শোষক এবং মড়াখোরদের কোনো জাত থাকে না। ওরা একই জাতের, একই গোত্রের।

সুলতানা পানির পিপাসায় কাতর। তবু উঠতে পারছে না। সে দেখলো, অসংখ্য দাঁড়কাক পালক ঝরিয়ে ঘরময় ভরে তুলছে। সে তলিয়ে যাচ্ছে পালকের স্তূপে। বিকট দুর্গন্ধযুক্ত পালকের ভারে সে নিঃশ্বাসও ফেলতে পারছে না। সুলতানা ডাকতে চেষ্টা করলো- আইনুল, আইনুল!

সুলতানা দেখলো, সামনে যে কংকালটি দাঁড়িয়েছিল, কথা বলছিল, হাঁটছিল, হাসছিল- সে এখন আর নেই।

www.pathagar.com

প্রবল পিপাসায় আইনুল অত্যন্ত কাতর। অবসন্ন দৃষ্টিতে সে অফিসের চারদিকে তাকায়। হাতের কাছেই বোতল ভর্তি পানি। তবু তার সেদিকে খেয়াল নেই। কলিং বেল বাজিয়ে পিয়নকে ডাকে। পিয়ন পানি দিয়ে যায়। আইনুল পানির গ্লাস মুখে তুলে কেবল এক ঢোক নিয়েছে, আর তখন- ঠিক তখনই তার মনে হলো, পানির সাথে কাকের পালক তার গলার কণ্ঠনালীতে গিয়ে আটকে গেছে। হাতে গ্লাস ধরা অবস্থায় তার প্রচন্ড বিষম লাগলো। সে কাঁশতে থাকে। বাম্ হাতে বুক চেপে ধরে। কাঁশতে কাঁশতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়। আইনুলের হাত থেকে গ্লাসটি ছিটকে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে শব্দের কম্পন তোলে। তার মনে হলো, গ্লাস নয়- যেন এইমাত্র একটি পৃথিবী প্রচন্ড শব্দে ভেঙে যাবার আয়োজনে কয়েক মিনিট ভূমিকম্প হলো। আইনুল ভাঙা গ্লাসের কাঁচের টুকরোর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। সে দেখে, কাঁচের টুকরো থেকে অসংখ্য কাকের পালক তার দিকে উড়ে উড়ে আসছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু সে যে দিকেই মুখ ফেরাক না কেন, সে দিকেই কেবল ঐ একই দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আইনুলের বমন ইচ্ছা হয়। তলপেটে গুলিয়ে ওঠা বস্তুগুলোও যেন বিদ্রোহ করছে। সেই সাথে প্রস্রাবের বেগ। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বাথরুমের দিকে যেতে চায়। কিন্তু দু' পা যেতেই মাথা ঘুরে আইনুল পড়ে যায়। তার পড়ে যাবার সাথে সাথে পতোনোন্মুখ পৃথিবীর তাবৎ ঘৃণার আস্তরণে আইনুলের মুখমন্ডল ঢেকে যায়।

আইনুল তবু পরাজিত হতে চায় না।

সে শেষবারের মতো উঠতে চেষ্টা করে। একটি অদৃশ্য বৃক্ষের কান্ড যেন তার পাশে এসে দাঁড়ায়। সেটা ধরে আইনুল উঠে দাঁড়ায়। একটু একটু করে। সে অনেকটা শান্ত। তবুও তার এখনো বমন ইচ্ছা এবং প্রস্রাবের বেগ আছে। সে কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর পকেটে হাত দিয়ে ভাঁজ করা খামটি বার করে আনলো। খামের ভেতর থেকে কালো বর্ণের অক্ষরের খোলস থেকে একটি বিষধর অজগর হিস হিস করে উঠলো। আইনুল সাপটির ঠোঁটে চুমো দিয়ে আবার সেটাকে পকেটে রাখলো। কালো অক্ষরের সাপটি পকেট থেকে ক্রমান্বয়ে আইনুলের হৃদয়ে প্রবেশ করলো। আর আশ্চর্য, সাথে সাথে আইনুল মেরুদন্ড সোজা করে এই প্রথমবারের মতো পৃথিবীর বুকে দাঁড়ালো। তার রক্তবিন্দু থেকে একটা আনন্দকোরাস প্রতিধ্বনিত হয়ে অফিস রুমে আছড়ে পড়লো। অস্ফুটে যেন পৃথিবীকে সে জানিয়ে দিল,

সাবধান! আমার শরীরে গোলামের রক্ত নেই।

আইনুলের তলপেট প্রস্রাব এবং বমিতে মোচড় দিয়ে উঠলো। অফিসে যে আরো কিছু লোক আছে, ওপাশের এয়ার কন্ডিশন রুমে দাঁড়কাকের মতো একজন পাক্কা বদমাশ আছে- সে সব চিন্তা না করেই কিংবা সবকিছু জেনে-বুঝেই আইনুল সবার

www.pathagar.com

সামনে, অফিস রুমে প্যান্টের চেইন খুলে প্রস্রাব এবং হড় হড় করে বমি করে দিল। অন্যরা চেয়ার ছেড়ে চিৎকার করে উঠলো,

আরে আরে, করেন কি হক সাহেব! ছি ছি! অফিস রুমে .....

খবরদার! চিৎকার করবে না। আইনুলের ভেতর থেকে সাপটি সবাইকে সতর্ক করে দিল।

আইনুল প্রস্রাব এবং বমি শেষে সবার দিকে এমনভাবে তাকালো, যাতে করে তারা ঘাবড়ে গেল। চিরকালের শান্তশিষ্ট, ভদ্র, নিরীহ মানুষ আইনুল- আজকে সেই মাটির মানুষটির চোখ থেকে যেন আগুনের হল্কা ছুটছে।

আইনুল প্রস্রাব আর বমি দিয়ে সবাইকে যেন বুঝিয়ে দিল, 'আইনুল আর পরাজিত হবে না।'

সে কারুর সাথে কোনো কথা না বলে প্যান্টের চেইন লাগিয়ে দেহটা টান টান করে নিল। এভাবে 'বিদ্রোহ' এবং 'স্বাধীনতার' প্রথম প্রকাশ ঘটিয়ে মাথা উঁচু করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সে নিচে নামলো। ভেতরের অতি পরিচিত মানুষটি ফিস ফিস করে বললো,

নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে এবার কোথায় যাবে আইনুল?

এ প্রশ্নে সে আদৌ না ঘাবড়ে বরং নিজেকেই শোনালো,

বাংলাদেশ বাজা নয়। হতে পারে দেশটাকে বেশ্যা ভেবে এক শ্রেণীর লম্পট বাংলাদেশকে ক্রমাগত অপবিত্র করছে। কি চমৎকার জঘন্য শব্দ- 'বেশ্যা'! আইনুল ঘৃণায় দু' বার থুথু ফেলে। আবার তার দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়ে ওঠে। বিড় বিড় করে বলে, যারা ঘৃণ্য কামনা চরিতার্থ করে, নোংরা পানি ফেলে চলে যায় কাপুরুষের মতো, সেইসব পুরুষ পশুদের জন্যে 'বেশ্যা'র সম্পূরক কোনো শব্দ নেই। তাদের জন্যে কোনো যুতসই গালি অভিধানে নেই। কি জঘন্য সুন্দর! সে আবারও দু' বার থুথু ফেলে। তারপর একসময় মিছিলের অগ্রভাগের নেতার মতো দু' বাহু ওপরে তুলে চিৎকার করে বলে,

পৃথিবীর শকুন এবং দাঁড়কাকেরা শুনছো! তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো!

দেশটা বেশ্যা নয়।

দেশটা কারুর বাবার নয়।

দেশটা কারুর একার সম্পত্তি নয়।

এ দেশটা আমারও। এ পৃথিবীর আমিও একজন অংশিদার। এখানে আমারও সমান অধিকার আছে।

আমি আমার পাওনা এবং অধিকার কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে চাই।

www.pathagar.com

আইনুল রাস্তায় নেমে আসে। মাথার ওপর আকাশ, টুকরো টুকরো মেঘ, সূর্যের আলো– এতদিন পর, এই প্রথম সব কিছু থেকে আইনুল তার পাওনা এবং অধিকার গ্রহণ করতে থাকে। অজস্র ভাঙনের ভেতর থেকে বাতাসের শা–শা শব্দ মিলেমিশে আইনুলের সম্মুখে যেন খুলে যাচ্ছে একের পর এক রহস্যের দরোজা।

আইনুল হাঁটছে। তার ভেতর থেকে সাপটি হিস হিস করে শব্দ তুলছে। বিষধর সাপটি যেন বলছে,

যারা প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ জানে না, তারাই বার বার মার খায়। গোলামের কোনো স্বাধীন কণ্ঠস্বর থাকে না। কিন্তু আইনুল, তুমি গোলাম নও। তোমার কণ্ঠস্বর আরো জোরে উচ্চকিত হোক। তোমার প্রতিবাদে, চিৎকারে, ঘৃণা এবং ধিক্কারে শোষক পুরুষবেশ্যাদের পায়ের তলায় ধ্বস নামুক। তুমি পারবে আইনুল, তুমি নিশ্চয়ই পারবে।

আইনুল এক দুঃসাহসী বাহনের পিঠে সওয়ার হয়। তার হৃদয়ে বিষধর অজগর। সে যাচ্ছে অন্য এক নতুন পৃথিবী নির্মাণ করতে। যেখানে গোলাম–মনিবের সম্পর্ক থাকবে না। যেখানে দাঁড়কাক আর শকুন থাকবে না। সে পৃথিবীর পলিমাটিতে বৃষ্টি নামবে। মাটিতে ফসল ফলবে। পানিতে মাছ থাকবে। বৃক্ষে ফল থাকবে। ফুল ফুটবে। পাখিরা স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াবে। নবান্নের উৎসব হবে। সেখানে রাজা নেই, প্রজা নেই। আছে কেবল মানুষ, মানুষ আর মানুষ।

আইনুলের বাহন একটা দরোজার সামনে এসে থেমে যায়। অসম্ভব আক্রোশের নিঃশ্বাস ফুলে ফুলে একই সাথে দমকা বাতাসের মতো প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে। তার নিঃশ্বাসে পাঁচটি মহাসাগরে কম্পন ওঠে। সাতটি মহাদেশে তিন মিনিটের জন্যে ভূমিকম্প হয়ে যায়।

আইনুল দরোজার কড়া নেড়ে ডাক দেয়,

সুলতানা, সুলতানা–দরোজা খোলো।

সুলতানার হাতের চাপে দরোজা দু' ভাঁজ হয়ে দু' দিকে ফাঁক হয়ে যায়। আইনুল ভেতরে প্রবেশ করে।

আজ এত রাত হলো? সুলতানা জানতে চায়। তার চোখে–মুখে সকালে আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। কণ্ঠস্বরও শুকনো। চোখের ভেতর মরা মাছের চাহনীর মতো নিঃস্তব্ধতা।

www.pathagar.com

আইনুল সুলতানার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। শুধু একবার তার দিকে তাকালো। আইনুলের চোখের দিকে তাকিয়ে সুলতানা শিউরে উঠলো। চোখ তো নয়, যেন জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে!

অন্যদিনের মতো আইনুল আজ আর বাথরুমে গেল না। চা-নাস্তার জন্যে বায়নাও ধরলো না। জামা-জুতো ছাড়তে ছাড়তে কেবল বললো, রাতে আজ আর কিছু খাবো না।

কেন?

ভালো লাগছে না।

আমারও আজ কিছু ভালো লাগছে না। সকালে তুমি অফিসে যাবার পর কিসব অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেল! সুলতানা বললো।

আইনুল যেন সবই জেনে গেছে এমন ভঙ্গি করে বললো, দাঁড়কাক আর শকুন তো! তা ছাড়া আর কিইবা দেখবে?

সুলতানা অবাক হলো। আইনুল জানলো কিভাবে?

বেশিদিন আর দেখতে হবে না। সময় পরিবর্তন হবে। আইনুলের কথা শেষ না হতেই তার ভেতর থেকে সাপটি হিস হিস করে সম্মতি জানালো। সুলতানা বললো, শব্দ কিসের?

আইনুল কোনো জবাব না দিয়ে বললো, চল শুতে যাই। কেউ যখন খাবো না, তখন আর রাত করে লাভ কি?

সুলতানা এমনিতেই ভয়ে সারাদিন অস্থির এবং দুর্বল হয়ে আছে। আইনুলের সম্মতি পেয়ে সে দ্রুত বিছানায় গেল। আইনুল দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারে আঙুল রেখে কি যেন বলছে। সুলতানা হেসে উঠলো,

এখনই দিন গুণ্‌ছো! সাহেব, এখনো অনেক দেরি।.....

সুলতানা জানে না দিন গোণার কারণ। কিন্তু আইনুল জানে। সে জানে- যে শিশু আসবে. যারা আসবে, তারা যেন আর একজন আইনুল হয়ে না জন্মায়। ১৯৯১, '৯২, '৯৩ কিংবা দু' হাজার কিংবা তিন হাজার বছর সময় লাগুক, তবু তারা আসুক। আইনুলের বিশ্বাস, তারা আসবে। যারা পৃথিবীতে এসে এ প্রাচীন দেয়ালকে ভেঙে নতুন পৃথিবী নির্মাণ করবে। তারা আসবে। আজ না হোক কাল। নিশ্চয়ই আসবে। আইনুলের চোখে-মুখে স্বপ্নের কুয়াশারা হেঁটে যায়। তার ভেতর থেকে বিষধর সাপটি হিস হিস করে সম্মতি জানায়।

সুলতানা আইনুলের হাত ধরে বিছানায় টানে। বলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। কাল আবার অফিস আছে না! সকালের ঘটনাগুলো বলতে গিয়েও আর খুলে বললো না

www.pathagar.com

সুলতানা। অফিসে যাবার কথা শুনে আইনুল একটু ম্লান হাসলো। হাসবার কারণ সুলতানা জানে না। আইনুল সুলতানার পাশে শুয়ে পড়লো।

সুলতানা বললো, বাতিটা নিভিয়ে দিই?

না! আইনুলের কঠিন উচ্চারণ। বললো,

বাতি জ্বলবে। উজ্জ্বল আলোক শিখায় আমরা পরাজয়ের স্তূপকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করবো। জ্বলজ্বলে আলোতে বিজয় সরণি আরো উজ্জ্বল হোক। উত্তর প্রজন্মকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী নয়, আমরা আলোকিত পৃথিবী উপহার দিতে চাই।

পাগল! বলে সুলতানা কপট ক্ষোভ প্রকাশ করে। সে কাত হয়ে তার বেকায়দা জায়গার আঁচড়টির দিকে আইনুলের দৃষ্টি গ্রাহ্যের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। আঁচড়টির ওপর থেকে সুলতানা শাড়ি ও পেটিকোট আলগা করে ধরে। একশো ওয়াটের উজ্জ্বল আলোতে সুলতানার হলুদ বর্ণের ত্বকে আঁচড়টি আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ডিমের কুসুমের মধ্যে একটি গাঢ় বর্ণের রক্তাভ আঁচড়। আইনুল আঙুল দিয়ে আঁচড়টি নেড়েচেড়ে দেখে। সুলতানা এক ধরনের আরামমিশ্রিত শিহরণে ইস্ শব্দে সামান্য দুলে ওঠে। আহ্ ছাড়ো না, লাগে তো!

আইনুলের মনে হয়- আঁচড় নয়, ক্ষত নয়। হলেও এটা সুলতানার নয়। বাংলাদেশের। এশীয় মহাদেশের। এ ক্ষত সমগ্র পৃথিবীর। ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মহাদেশ ভিজে যাচ্ছে। রক্তে প্লাবিত হচ্ছে। চিৎকার করছে। স-শব্দে আছড়ে পড়ছে। বাঁচাও, বাঁচাও বলে আর্তনাদ করছে। আর পুরুষবেশ্যারা মনিব সেজে তাদের কামনা চরিতার্থ করে ধূর্ত দাঁড়কাক আর শকুনের মতো পালক ঝরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তেই আইনুল আনমনা হয়ে যায়। ভেতরের সাপটির হিস হিস শব্দে সে জেগে ওঠে। সুলতানার অস্থিরতায় আইনুল পুনরায় সচকিত হয়।

এবং তারপর।-

তারপর আইনুল ও সুলতানা একটি যৌথ স্বাধীনতার সাম্পানে উঠে বসে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে আছড়ে পড়ছে গুল্যভার নদীর দু' কূল। বৈঠার আঘাতে নদীতে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে। বিদ্যুৎ ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠছে। আইনুল অস্ফুটে বললো,

আহ্ নদী-আমার বাংলাদেশ! তোমার ব-দ্বীপে জেগে ওঠা গোলাপী চর। চরে ক্ষতের চিহ্ন। ক্ষত থেকে রক্তের প্লাবন। তবুও হতাশ হয়ো না। ওটা ক্ষত নয়, আঁচড় নয়, বিজয় সরণি। দেখে নিও, রক্তের প্লাবন বেয়ে সাঁতরে সাঁতরে কূলে উঠে আসবে

www.pathagar.com

আগামীর সাহসী প্রজন্ম। সকল পরাজয়ের গ্লানি ছিটকে ফেলে দিয়ে তোমাকে তারা শুচি-শুদ্ধ করে নতুনভাবে বরণ করে নেবে। তোমাকে তারা রাহুমুক্ত করবে সুলতানা!

সুলতানার ঠোঁটের ওপর আইনুলের ভারমুক্ত প্রশান্তির নিঃশ্বাস।

আহ্ সুলতানা- আমার বাংলাদেশ! কি চমৎকার এ আলোকিত উজ্জ্বল উৎসব!

আইনুলের শিরদাঁড়া ধনুকের ছিলার মতো টান টান।

সুলতানা সবিস্ময়ে অনুভব করে, একটা বজ্রমুষ্টি দম্ভাঘাতে ঠাস ঠাস করে খুলে যাচ্ছে কোমল পৃথিবীর কবন্ধ দরোজা। বেপরোয়া আইনুল প্রতিটি দরোজা পেরিয়ে অশ্ববেগে ছুটে যাচ্ছে বিজয়ের উল্লাসে অচেনা আর এক পৃথিবীতে।

সুলতানা ক্লান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ যৌথ সাম্পান যাত্রা আর কতদূর?

আইনুল প্রগাঢ় স্বপ্নের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো

অনেক দূর! যতোক্ষণ না সকালের নতুন সূর্য আমাদেরকে স্পর্শ করে।

নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, জানুয়ারি ১৯৯২

www.pathagar.com

প্রেম কিংবা পাপ

কোবলাল কেঁদে উঠলো

সদর হাসপাতালের পেছনে কোবলালের ঝুপড়ি। তিন পুরুষের পেশা-তোম। লাশ কাটা তার পেশা এবং নেশা। কোবলালের বয়স এখন ষাট। গায়ে তেমন শক্তি নেই। চোখেও ভালো দেখতে পায় না। তবুও লাশ কাটতে তার কোনো অসুবিধা হয়না।

হাসপাতালে কোবলালের খুব কদর। কদর হয় তখনই, যখন কোনো লাশ মর্গে আসে। লাশ এলেই কোবলালের ডাক পড়ে। তার নির্ধারিত কোনো বেতন নেই। লাশ গুণে গুণে তাকে টাকা দেয়া হয়। কোনোদিন দু-পাঁচটা লাশ কাটে। কোনোদিন আবার ফাঁকাও যায়। যেদিন কোনো লাশ আসেনা সেদিন আর কোবলালের ডাক পড়ে না। সেদিন সে সারাদিন ঝুপড়ির ভেতর একাকী শুয়ে শুয়ে সময় কাটায়।

কোবলালের ঘরে আর কেউ নেই। সে একা।

বাইশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। খুলনার হাসপাতালের ডোম রতনের মেয়ে দেবীর সাথে। দেবীর বয়স তখন ষোল। গায়ের রং শ্যামলা। হালকা পাতলা গড়নের। কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দরী। কোবলাল তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। দেবীও। হাতে পয়সা থাকলেই তারা বায়োস্কোপ, সিনেমায় যেত। দু'জনে মিলে একটি যৌথ ছবি তুলেছিল। ছবিটি বাঁধিয়ে ঝুপড়ির এক পাশে টাঙিয়ে রেখেছে কোবলাল।

কোবলালের সংসারটা ছিল মাত্র দু'জনের। বেশ আনন্দেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কোবলালের আয়ও বেশ হতো। প্রায় প্রতিদিনই দু'চারটা লাশ মর্গে আসতো। যে লাশ যত পচা, সে লাশের জন্যে কোবলালের বেশি টাকার চাহিদা।

বিয়ের তিন বছর পর দেবীর পেটে সন্তান এলো। কোবলালের মনে আনন্দ আর ধরেনা। সে বাবা হতে যাচ্ছে। দেবীও খুশি। তাদের দু'জনের সংসারে আর একজন আসছে! তাদের ইচ্ছে, যে আসবে সে যদি ছেলে হয়, তবে তাকে লেখাপড়া শেখাবে। তিন পুরুষের পেশা-লাশ কাটার বিষয়টি ছেলের ওপরই নির্ভর করবে। তার ইচ্ছে হলে

www.pathagar.com

লাশ কাটবে, ইচ্ছে না হলে কাটবে না। তবু তাকে শিক্ষিত করে তুলবে কোবলাল।

দিনে দিনে দেবীর পেট আরও মোটা হয়ে ওঠে। রাতে শোবার পর মাঝে মাঝে কোবলালের হাতটা টেনে দেবী তার উঁচু পেটের ওপর চেপে ধরে। বলে– দ্যাকো, দ্যাকো, ইকানে বাচ্চা আচে। নড়তিচে। মাজে মাজে গুতো মারতিচে।

কোবলাল হেসে ওঠে। দেবীর মুখ ও মাথায় হাত দিয়ে আদর করে। আরও কাছে টেনে নিয়ে বুকে পিঠে হাত ঘষে। পরস্পর আরও ঘনিষ্ট হয়ে যায়।

মর্গে সন্ধ্যার দিকে সরসকাটি থেকে একটি লাশ এসেছে। কোবলালের ডাক পড়ে। ঝুপড়ি থেকে বার হবার সময় দেবী বাধা দেয়। আজ যাইবানা। আমার ক্যামুন ভয় ভয় করতিচে।

কোবলাল দেবীর ঠোঁট টিপে দিয়ে হেসে ওঠে। 'কুনো ভয় নেই, দেবী! কাজ হয়ে গেলিই চলি আসপো।' দেবী আর কিছু বলেনা।

লাশটি নিয়ে কি সব ঝামেলা ছিল। দু'দিনের লাশ। মেয়ে মানুষের।। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কেউ কেউ বলছে, না। ওকে ওর স্বামী মেরে তারপর গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

কোবলালের ওসব কান কথার কোনো দরকার নেই। তার চাই লাশ। লাশ কাটতে পারলেই সে খুশি। তার আজ আরও দু'দশটা লাশ কাটার ইচ্ছে জাগে। কেনোনা দু'একদিনের মধ্যেই দেবীর বাচ্চা হবে। অনেক টাকার প্রয়োজন। সুতরাং একটি লাশ কাটায় আজ সে তেমন একটা খুশি হতে পারলোনা। আসার সময় দেবীর শরীরটা খারাপ দেখে এসেছে। কোবলালের সে কথা মনে পড়তেই, লাশ কাটা শেষ করে সে তাড়াতাড়ি ঝুপড়ির দিকে ছুটলো।

ঝুপড়ির কাছাকাছি আসতেই কোবলাল দেবীর চিৎকার শুনতে পেলো–দেবী আর্তনাদ করছে। ঝুপড়িতে ঢুকেই কোবলাল হতবাক। দেবী পাটির ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে যেন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। মুখে ঘাম ঝরে ঝরে পড়ছে। দেবীর মুখ দিয়ে আহ্ উহ্ ছাড়া আর কোনো শব্দ বার হয়না। হঠাৎ দেবীর শরীরের নিচের দিকে কোবলালের চোখ যায়। দেবীর সারা কাপড় রক্তে ভিজে গেছে। পাটিতেও রক্তের বন্যা। দেবীর শরীরের নিচের অংগ দিয়ে কেবলই অঝোর ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কি করবে কোবলাল বুঝে উঠতে পারেনা। সে দেবীকে নিয়ে দ্রুত ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে। তখন অনেক রাত।

অনেক গভীর রাত। কোবলাল অস্থিরভাবে হাসপাতালের বারান্দায় হাঁটছে। তার বুকটা ধুকপুক করছে। দেবীর কি হবে?

আসলে দেবীর কিছুই হয় না। দেবীও থাকেনা। দেবী মারা গেছে!

দেবীর মৃত্যুর পর কোবলাল আর বিয়ে করেনি। কেনোনা, দেবীর প্রেম–

www.pathagar.com

ভালোবাসায় সে আজো বন্দী। দেবীর মতো এত ভালোবাসা তাকে আর কে দেবে? কোবলালের বিশ্বাস– দেবীর মতো আর কেউ তাকে এত প্রেম ভালোবাসা দিতে পারবে না।

দেবীর মৃত্যুর পর কোবলাল আরও বেশি পাষাণ হয়ে গেছে। দেবী থাকতে, লাশ কাটার সময় তার মাঝে মাঝে কেমন একটা মায়া মায়া লাগতো। মেয়ে মানুষের লাশ কাটতে গেলে কোবলাল একটু দুর্বল হয়ে পড়তো। এখন আর তা হয়না। এখন সে লাশ পেলে অধিক খুশি হয়। লাশ কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে আনন্দে শিউরে ওঠে।

সেকি কেবল প্রতিশোধ স্পৃহায়? নাকি দেবীর প্রতি গভীর ভালোবাসার টানে?

প্রায় রাতে ক্লান্ত অবস্থায় ঝুপড়িতে ফিরে তাদের বাঁধানো ছবিটি হাতে তুলে নেয়। দেবীর ছবিটিতে চুমো দিয়ে কোবলাল অস্ফুটে বলে, দেবী তুই মরিসনি। এইতো তুই আমার বুকের মদ্যি বাচি আচিস। তোকে আমি মরতি দোবো না দেবী!

কোবলাল তবুও কাঁদে না। কাঁদবে কেন? তার বিশ্বাস–দেবী মরেনি। মরতে পারে না। ভালোবাসা কি কোনোদিন মরে?

সাতদিন হাসপাতালের মর্গে কোনো লাশ আসেনি। লাশ না এলে কোবলালের ডাক পড়েনা। এ ক'দিনে তার জমানো সামান্য টাকা শেষ হয়ে গেছে। কাল থেকে একরকম না খেয়ে আছে। বয়সকালে কোবলাল ক্ষুধা সহ্য করতে পারতো। এখন তার বয়স ষাট। এ বয়সে আর ক্ষুধা সহ্য হয়না। কোবলালের ক্ষুধায় মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। যখন তার মেজাজ খারাপ থাকে, তখন শুধু খিস্তি খেউড় করে। তার মুখে তখন আর কিছুই আটকায় না। কোবলালের পেটের ভেতর ক্ষুধার আগুন মোচড় দিয়ে ওঠে।

ক্ষুধার আগুন বড় আগুন। এ আগুনে জ্বালিয়ে দেয় গ্রাম, দেশ, মহাদেশ এমনকি গোটা পৃথিবী। পানিতে এ আগুন নেভে না।

রাগে ক্ষোভে কোবলালের ইচ্ছে হয় নিজের গোশত নিজে চিবোয়। ঝুপড়িতে শুয়ে গড়াগড়ি দেয় আর খিস্তি খেউড় করতে থাকে কোবলাল। শালার মাগীরা মরতে পারিসনে? বিষ দড়ি আগুন পানি কিছুই চোখে দেখিসনে। হারামীর বাচ্চারা, তোরা না মরলি কোবলাল কি আঙুল চুষে চুষে বাচপে?

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আর একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। মর্গে এখনো কোনো লাশ আসেনি। কোবলাল হতাশ হয়ে রাগে আর দুঃখে মানুষের মুন্ডপাত করে। আজও তার না খেয়ে থাকতে হবে ভেবে সে ভীষণ কষ্ট পায়। কিন্তু কোবলাল কাঁদতে পারেনা। দেবীর ছবিটা হাতে তুলে নেয়। বলে, দেবী তুই ক্যামুন আচিস? আমারে ভুলি যাসনিতো?

দূর থেকে একটি ডাক এ সময়ে ভেসে আসে। কোবলাল, কোবলাল ঘরে আছিস নাকি?

www.pathagar.com

কোবলালের নাম ধরে পুলিশের লোক ডাকছে। তার বয়স ষাট হলে কি হবে, সবাই তাকে তুই-তুকার করে কথা বলে। কোবলাল কিছু মনে করেনা।

ডোম বলে কথা! সে পচা-মড়া কাটে। তার আবার সম্মান কি?

পুলিশের ডাকের অর্থ কোবলাল বোঝে। তার বুকের ভেতর আশার আলো জ্বলে ওঠে। নিশ্চয়ই মর্গে লাশ এসেছে! আর লাশ মানে তার পেটে দু' মুঠো আজ অন্ন যাবে।

পুলিশের ডাকে কোবলাল ঝুপড়ি থেকে বার হয়ে আসে। তারপর দ্রুত পায়ে পুলিশের পিছে পিছে মর্গে যায়।

একটি লাশ শেষ বেলায় এসেছে। পাঁচদিনের পচা লাশটি নিয়ে পুলিশ খুবই বিপদে পড়েছে। এসব ব্যাপারে যত ঝুট-ঝামেলা-তা কেবল পুলিশদেরকেই পোহাতে হয়। লাশটি এনেছে আলীপুর থেকে। এক শ্যাওলার দাম আঁটা খানার বোদের ভেতর লাশটিকে মেরে পুতে রাখা হয়েছিল। পুলিশ অনেক খোঁজা-খুঁজির পর খানার বোদ থেকে লাশটিকে উদ্ধার করে কোনো রকম বেঁধে-ছেদে নিয়ে এসেছে।

কোবলাল মর্গে ঢোকে। মর্গের ভেতর মাত্র একটি বাল্ব। খুব কম আলো। তবু লাশ কাটতে তার অসুবিধা হবেনা। কেনোনা অন্তত পঁয়তাল্লিশ বছরের তার লাশ কাটার অভিজ্ঞতা। কোবলাল লাশটিকে ঠিকমতো রেখে তার শরীরের বাঁধন কেটে দেয়। লাশের গায়ের চট এবং ছেঁড়া বিছানা আগলা করে দূরে ফেলে রাখে। একেবারেই পচা লাশ। বোদের নিচে থাকার কারণে লাশের চামড়া এবং গোশত একেবারেই পচে গেছে। চট এবং বিছানার পাতির সাথে লাশের শরীরের অনেকটা চামড়া এবং গোশত উঠে গেছে। জায়গাগুলো কেমন বীভৎস। রস এবং কষাণী ঝরে ঝরে পড়ছে। লাশ থেকে দুর্গন্ধ বার হচ্ছে। মর্গের বাইরে সবাই নাকে মুখে কাপড় গুঁজে অপেক্ষা করছে। কোবলালকে জলদি করে কাজ সারার জন্যে তাড়া দিচ্ছে। গন্ধে তারা টিকতে পারছেনা।

লাশের গন্ধ-কোবলালের কাছে কোনো ব্যাপারই না। এই দীর্ঘ জীবনে সে এসব বদ গন্ধ হজম করার অভ্যাস রপ্ত করে নিয়েছে। তার কাছে লাশের দুর্গন্ধ যেন কস্তুরির ঘ্রাণ। তার নাকে কোনো কাপড় বাঁধার প্রয়োজন করেনা। বাইরে থেকে পুলিশ হাঁক দেয়, তাড়াতাড়ি কর, কোবলাল।

কোবলাল মর্গ থেকেই চিৎকার করে বলে, ইটাতো একদম পচা লাশ, একশো টাকার কমে হবি না, সাহেব! বেশি কথা বলার মতো সময় তাদের নেই। অনেক অনুনয়ের পর কোবলাল আশি টাকাতে রাজি হয়ে যায়।

কোবলালের চোখ আনন্দে চিক চিক করে ওঠে। এক সপ্তাহ পরে সে লাশ পেয়েছে। তাও আবার পচা লাশ। কোবলাল ডান হাতে ধারালো ছুরিটা নিয়ে লাশের কাছাকাছি চলে আসে। লাশটিকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। কোবলালের বাম হাত লাশের

www.pathagar.com

বুকের ওপর। গোশত পচে যাবার কারণে কোবলালের বাম হাতের আঙুলগুলো লাশের গোশতের ভেতর দেবে যেতে থাকে। সে লাশের নিচের অংশও দেখে নেয়।

লাশটি মেয়ে মানুষের। অবশ্য হাসপাতালের মর্গে যত লাশ আসে-তার অধিকাংশই মেয়ে মানুষের। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে, কেউ বিষ খেয়ে, কেউ গায়ে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করে। এ মেয়ে লোকটি কোন্ দুঃখে আত্মহত্যা করেছে, নাকি কেউ মেরে এভাবে পুতে রেখেছিল- কোবলাল তা জানে না। এসব নিয়ে সে কোনোদিন ভাবেও না। তার কাজ লাশ কাটা। লাশ পেলেই সে খুশি।

কোবলাল ছুরিটা হাতের তালুতে কয়েকবার ঘষে নেয়। তারপর সে ছুরিটা লাশের গায়ে কেবল স্পর্শ করবে এমন সময় তার হাতটা কেঁপে ওঠে। ছুরিটা থেমে যায়।

কোবলালের চোখ দু'টো লাশের মুখের ওপর। আলো-আঁধারির ভেতর লাশের চোখ দু'টো যেন কিসব কথা বলে যাচ্ছে কোবলালকে। কোবলাল আরো ভালো করে লাশটিকে দেখে নেয়। ঠিক দেবীর মতো মুখটা। চোখ দু'টোও একইরকম। দেবীর মাথায়ও এমন ঘন-কালো লম্বা চুল ছিল। লাশটির পেট অস্বাভাবিক ফোলা। পেটে বাচ্চা না থাকলে সাধারণত কোনো লাশের পেট এত ফোলা হয় না। কোবলালের এসব ব্যাপারে ভালো অভিজ্ঞতা আছে। ঠিক দেবীরও এরকম মোটা পেট হয়েছিল। তার পেটেও বাচ্চা ছিল। এ যেন দেবীরই দেহ। কোবলাল দু'হাতে মুখ ঢেকে দু'পা পিছে আসে।

একদিকে লাশ, দেবীর দেহের প্রতিকৃতি, অন্যদিকে কোবলালের পেটে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুন!

বাইরে থেকে পুলিশ হাঁক দেয়, তাড়াতাড়ি কর কোবলাল! আকাশে মেঘ। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

কোবলালের কানে সে সব চিৎকার ধ্বনি পৌঁছেনা। সে কেবল দেখতে পায়-তার সামনে স্বয়ং দেবী শুয়ে আছে। তার পেটে বাচ্চা শিশু। দু'একদিন পরই দেবীর সন্তান হবে। দেবী হাসছে। আবার ভয়ে কাঁদছে। কোবলাল দেবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ভয় নেই দেবী, তোর কুনো অসুবিদা হবেনা।

মর্গের ভেতর কোনো শব্দ নেই। কোবলালও বেরুচ্ছেনা। লাশ কাটতে কোবলালের তো এতো সময় লাগার কথা নয়? পুলিশরা নাকে মুখে কাপড় এঁটে মর্গের জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোবলাল পচা লাশের মুখের ওপর মুখ রেখে বিড়বিড় করে কি সব বলে যাচ্ছে। বাইরে থেকে পুলিশ হাঁক দেয়, কোবলাল, এত দেরি কেন?

কোবলাল কোনো জবাব দেয়না। কেবল লাশের মুখ থেকে নিজের মুখটা তুলে নিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কোবলালের মুখে-লাশের পচা গোশতের আঁশ এবং কষাণী-

www.pathagar.com

রস লেগে আছে। দু' হাতে নিজের মুখ ঢেকে জোরে, আরো জোরে কোবলাল কাঁদতে থাকে। কেবলই কাঁদে।

নদী উপাখ্যান

প্রাচীনকালে এখানে কোনো নদী ছিল না। কিন্তু একদিন নদী হয়ে গেল।

কপোতাক্ষ নদ। দক্ষিণের ভাটি অঞ্চলে এর ঐতিহ্য বহু পুরনো। এর দু' পাড়ের বাসিন্দারা 'নদ' বলে না। বলে নদী। এটাই তাদের কাছে শুদ্ধ। নদীর পশ্চিম পাড়ে একটি গ্রাম। এপাড়েই কিছু বসতবাড়ি। ওপাড়ে বিস্তীর্ণ চরে এখন আবাদ হয়। নদীর পাড় ঘেঁষে কয়েকটি বাড়ি। এসব বাড়ির মধ্যেই একটি কিশোর দিনে দিনে বড় হয়। বড় হতে হতে শ্যাম বর্ণের কিশোরটি একদিন যুবক হয়ে ওঠে। মাঠে হাল চাষ করে। নদীতে মাছ ধরে। সাঁতার কাটে।

পাড়ের পাশাপাশি আর একটি বাড়িতে নীরবে নিঃশব্দে একটি মেয়ে বড় হতে থাকে। সবার অগোচরে একদিন সে বড় হয়ে যায়। ঢিলেঢালা ফ্রক পরে বুড়ি চু' খেলার সময়ও মেয়েটি তার বয়স বুঝতে পারে না। মেয়েটি লাফিয়ে লাফিয়ে দড়ি খেলা খেলে। লাফানোর সাথে সাথে তার সদ্যস্ফীত বুক দু' টোও লাফায়। মা' র চোখে পড়ে। ধমক দিয়ে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপরই মেয়েটির শরীরে আকস্মিকভাবে নারীসুলভ পরিবর্তন আসে। তাকে আর ফ্রক পরতে দেয় না। মেয়েটি শাড়ি পরে। কিন্তু গ্রামের মেয়ে। সামর্থ নেই বলে ব্লাউজ পরতে পারে না। শাড়ির আঁচল আঁটসাট করে বুকে জড়িয়ে নদীতে পানি আনতে যায়। কলস ভরে পানি নিয়ে আসার সময় যুবকটি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। মেয়েটি ছন্দে ছন্দে পা ফেলে বাড়ি চলে যায়। যুবকটির বুকে ঢেউ খেলে যায়। সে মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু তার সামনে এসে বলতে পারে না– পারু, তোকে আমি ভালোবাসি।

কাউকে ভালোবাসার মতো বয়স পারুর হয়েছে। কিন্তু কাকে সে ভালোবাসবে? সে তো জানে না– রহিম তার জন্যে, কেবল তার জন্যেই সারা বিকেল নদীর পাড়ে বসে বসে কাটায়। পারু আজকাল যখন-তখন ঘাটেও আসে না। সোমত্ত মেয়েকে তার মা বাড়ির বার হতে দিতে চায় না। তবুও পারু ছাগল বাঁধার নাম করে, হাঁস খোঁজার অজুহাতে বাড়ির বার হয়। সে যেন কাউকে তালাশ করে।

নদীর পাড়ে, এই ঘাটটায় কেবল একমনে বসে থাকে রহিম। রহিমকে দেখলে পারুর মনটা ভালো হয়ে যায়। কিন্তু তার সামনে গিয়ে কথা বলতে পারে না। আড়চোখে রহিমকে দেখে নেয়। হয়তোবা রহিমও। তবুও একটা দূরত্ব দু' জনের মধ্যে বাধা হয়ে আছে। রহিম অপেক্ষা করে সারা বিকেল। সন্ধ্যা হয়ে যায়। সে বাড়ি ফেরে

www.pathagar.com

হতাশ মনে। ভাবে, কাল ঠিকই দেখা হবে পারুর সাথে। কথা হবে।

কিন্তু হয় না। দিন যায়। মাস যায়, বছর যায়। পারুর সাথে তার কোনো কথা হয় না। অনেকদিন পর্যন্ত পারুর সাথে দেখাও হয় না।

রহিম সারাদিন মাঠে কাটিয়ে ক্লান্ত। তবুও বিকেল হলেই নদীর পাড়ে। পারু আর কলস নিয়ে নদীতে আসে না। রহিম নদীর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। নদীর ভেতর যেন কাউকে খোঁজ করে। প্রতিদিন। মাছরাঙা হঠাৎ ডুব দিয়ে মাছ শিকার করে চলে যায়। বকের দল, ওপাড়ের চরে শালিক, কাঁদা খোঁচা পাখির ঝাঁক আসছে আর যাচ্ছে। কত মানুষ ঘাটে আসে। পারু আর আসে না। রহিম তবু অপেক্ষা করতে থাকে।

এবার শ্রাবণ আসতে না আসতেই চারদিক পানিতে থই থই। পাশের মাঠ, বিল, খাল সবই পানিতে ভরে গেছে। নদীতে পানি বেড়েছে। ওপাড়ের চর এখন পানির নিচে। নদীর এক পাড় ভাঙে, আর এক পাড় গড়ে। এবার ভাঙছে এপাড়। নদীর ঢেউ কূলে আছড়ে পড়ছে। পাড়ের বড় বড় মাটির চাঙ ভেঙে নদীর বুকে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাঙতে ভাঙতে অনেক দূর এসেছে। পারুদের ঘরের কাছাকাছি। রহিম আঁতকে ওঠে। আর একটু হলেই পারুদের ঘর-বাড়ি ভেঙে নদীতে মিশে যাবে।

রহিম নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ায়। তার সামনেই পাড় ভাঙছে। সে পারুর কথা ভাবছে। পারুদের ঘরটি ভেঙে গেলে তারা কোথায় যাবে? রহিমের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। বুকে তার আগুন জ্বলে। নদীকে কসম করে বলে, আর ভেঙো না নদী। ঐ ঘরটি তুমি নিও না। আল্লাহর দোহাই লাগে নদী। ওখানে আমার ভালোবাসা আছে।

নদী তো আর কসম মানে না।

রহিম পাড়ের ওপর অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কিছুতেই পারুকে হারাতে দেবে না। নদী ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে যায়। ভাঙতে ভাঙতে রহিমের কাছে যায়। রহিমের পায়ের নিচ থেকে মাটির চাঙ ভেঙে পড়ে। তারপর নদীতে মিশে যায়। তারপর কোথায় যায় রহিম জানে না। কতদূর পর্যন্ত ভেঙে যায় রহিম জানে না। রহিম এখন নদীর বুকে। নদীর নিচে অনেক উদ্ভিদ। অনেক শ্যাওলা। ঢেউ ভাঙা মাতাল তরঙ্গ। ওদের সাথে মিলেমিশে রহিম এই ঘাটেই বেঁচে আছে। হয়তোবা কোনোদিন কলস নিয়ে পারু ঘাটে নামবে। যখন কলস দিয়ে পানিতে ঢেউ দেবে, তখন রহিম দু'চোখ ভরে পারুকে দেখে নেবে। ইচ্ছে করলে রহিম স্রোতের টানে আরো ভাটি অঞ্চলে যেতে পারতো। কিন্তু সে যায়নি। যাবে না। কেনোনা, এখানে তার ভালোবাসা আছে। পারু আছে।

আসলে পারু নেই।

যেখানে রহিম থাকবে না, সেখানে পারু থাকবে কেমন করে? সেও একদিন,

www.pathagar.com

একরাতে নদী হয়ে গেছে। ঠিক এই ঘাটটায়। যেখানে রহিম নদীর তরঙ্গ হয়ে বেঁচে আছে। পারুও সেখানে। পারু নদী হয়ে গেছে। পরিপূর্ণ এক নদী।

রহিম তরঙ্গ হয়ে নদীর বুকে বেঁচে আছে। যতোদিন নদী আছে, ততোদিন তরঙ্গ আছে। নদী এবং তরঙ্গ অভিন্ন সহযাত্রী। রাত-দিন, প্রতিটি প্রহর তারা মিলেমিশে আছে। কিন্তু তাদের যৌবনের ভালোবাসার কথাগুলো আজো তারা কেউ কাউকে বলতে পারেনি। কিংবা হয়তোবা পেরেছে। তা না হলে নদীতে ঢেউ উঠলেই তরঙ্গ অমনভাবে দুলে ওঠে কেন? তা না হলে নদীতে এখনো জোয়ার ভাটা বহে কেন?

সম্ভবত ঢেউয়ের সাথে হাই তুলে পারু তার ভালোবাসার আকূতি জানায়। আর রহিম সেই মাতাল তরঙ্গে দুলতে দুলতে গেয়ে ওঠে অমর ভাটিয়ালি সঙ্গীত।

সেই থেকে যারাই নদীতে আসে, তারাই একবার নদীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়। নদীর জোয়ার-ভাটা দেখে কেউ কেউ কেঁদে ওঠে। গহনা নৌকায় বসে মাঝিরাও আনমনা হয়ে যায়। কাদাখোঁচা পাখি, মাছরাঙা, বকের ঝাঁক, কবুতর- তারাও এ ঘাটে এসে থমকে দাঁড়ায়। রহিম আর পারুর প্রেমের অমরতায় তারাও বিস্মিত হয়। আকাশ কেঁদে ওঠে। মেঘ থেকে ঝমাঝম বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি নয়, সে তো কেবল বেদনার কান্না!

প্রতি মৌসুমে, একটি বিশেষ দিনে, কুয়াশা মালা গেঁথে নদীকে, এই ঘাটটিকে বরণ করে নেয়। পারু এবং রহিম তখন জোয়ার ভরা নদী হয়ে যায়। একটি পরিপূর্ণ নদী। প্রশান্ত এক নদী। তবুও দু'পাড়ের বাসিন্দাদের মনে প্রশ্ন জাগে, নদী এবং তরঙ্গের মিলন ঘটেছে তো?

রহিম এবং পারু- একে অপরকে চিনতে পেরেছে কি?

হয়তোবা পারেনি।

হয়তোবা পেরেছে। তা না হলে, সেই থেকে এপাড় আর কোনোদিন ভাঙেনি কেন? তা না হলে এ পাড়ে প্রতি মৌসুমে এত ফসল ফলে কেন? এত পাখি, এত কাশফুল কেন?

কিন্তু কপোতাক্ষর সেই দিন আর নেই।

এখন ঝিরঝির স্রোত। জোয়ার-ভাটাও মরে যাচ্ছে। নদীর মধ্যে কোথাও কোথাও চড়া পড়ে গেছে। নৌকাও চলতে পারে না। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তার বুক। পলিতে ভরে যাচ্ছে কপোতাক্ষ। এভাবে হয়তোবা একদিন এ নদী-নদী নামের অযোগ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু পারু আর রহিমের প্রেমের অমরগাঁথা সরব আখ্যান হয়ে তবুও বাঁকড়ার এই পাড়টি অমর হয়ে থাকবে চিরদিন। কেনোনা, পারু এবং রহিমের প্রেমের জন্যেই কপোতাক্ষর জন্ম হয়েছিল।

এ নদী কোনোদিন মরতে পারে না। না, কক্ষণো না।

www.pathagar.com

পুরাণগাঁথা

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী হেলেন। বিপুল তার ধন সম্পদ।

হেলেন টাইনডায়ুসের কন্যা বলে পরিচিত হলেও আসলে সে দেবরাজ জিউসের ঔরসজাত। হেলেনের মা লিডাকে জিউস ভালোবাসতো এবং হাঁসের ছদ্মবেশে লিডাকে দেখা দিত।

হেলেনের বিয়ে হয় স্পার্টার রাজা মেনিলাসের সাথে।

একবার আফ্রোদিতের সহায়তায় প্যারিস স্পার্টা ভ্রমণে গেল।

স্পর্টার রাজা তার অতিথি প্যারিসকে স্বাগত্ জানালো। সে মেনিলাসের রাজ প্রাসাদে অবস্থান করলো। কিন্তু কিছুদিন পরই প্যারিস্-মেনিলাসের অবর্তমানে তার সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে অপহরণ করে ট্রয়ে নিয়ে গেল।

মেনিলাসের সাথে বিয়ে হবার আগে হেলেনের অনেক পানি প্রার্থী ছিল। হেলেনের পিতা টাইনডায়ুস ছিল অত্যন্ত চালাক এবং ধূর্ত। তার অপূর্ব সুন্দরী কন্যা হেলেনের জন্যে তারও অহংকারের সীমা ছিলনা। সে ঠিক করলো, হেলেনকে নিয়ে, তার বিয়েকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের আয়োজন করবে। হেলেনের পিতা ঘোষণা দিল,

হেলেনের নির্বাচনই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। হেলেন যাকে স্বামী বলে গ্রহণ করবে, সে যদি কোনো সময় বিপদে পড়ে তাহলে প্রয়োজনে সবাই তাকে সাহায্য করবে।

হেলেন অসংখ্য পানি প্রার্থীদের মধ্য থেকে মেনিলাসকেই স্বামী হিসেবে পছন্দ করে।

প্যারিস হেলেনকে অপহরণ করে ট্রয়ে নিয়ে যাবার কারণে শর্ত অনুযায়ী মেনিলাস হেলেনের সকল পানি প্রার্থীর সাহায্য কামনা করে। ফলে তারা একত্রিত হয়ে ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে।

যুদ্ধে একিয়ানদের সম্মুখে ট্রজানরা টিকতে না পেরে পেছনে হটে গেল। ট্রজানরা এক সভায় প্যারিসকে বললো, হেলেন ও তার ধনসম্পদ ফিরিয়ে দাও। প্যারিস জবাবে বললো, ধনসম্পদ যা এনেছি তার চেয়েও বেশি ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সুন্দরী হেলেনকে ফেরত দেব না।

হেলেনের সৌন্দর্যে সমগ্র ট্রয় নগরী পাগলপ্রায়। বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। হেলেনকে কেন্দ্র করেই একিয়ান ও ট্রয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ চলে দীর্ঘকাল ধরে। যুদ্ধের দশ বছরে একিয়ান বাহিনী ট্রয় দখল করে নেয়। তারা ট্রয়ের সকল পুরুষকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে।

সুন্দরী এক রমণী হেলেনকে নিয়েই এই যুদ্ধ। দীর্ঘকালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ট্রয় নগরী একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। হেলেন ছিল একদিকে যেমন বিশ্ব সুন্দরী, অপরদিকে

www.pathagar.com

ছিল ততোধিক রহস্যময়ী। প্রকৃত অর্থে, সে যে কাকে ভালোবাসতো তা ছিল রহস্যাবৃত। হেলেন–নিজের কাছে নিজেই রহস্যের এক ধূম্রজাল।

তবুও মানুষের সত্যবিবেক এক সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হেলেনের মধ্যেও সেই আশ্চর্য চেতনা এবং অনুশোচনা জেগে ওঠে। পাপবোধের তীরের ফলায় সে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। প্যারিসের সাথে দিনের পর দিনে তার ব্যাভিচারের ফলে নিরীহ নরনারীর জীবনে দেখা দিয়েছে অসম্ভব দুঃখ–দুর্দশা। ট্রয় নগরীতে নেমে এসেছে ধ্বংস ও বিপর্যয়। এসবের জন্যে একমাত্র দায়ী গেলেন। হ্যা, হেলেনই।

সুন্দরী হেলেন নিজেকে অপরাধী মনে করে। ইচ্ছে করলে সে ট্রয় নগরী থেকে, প্যারিসের বন্ধন ছিন্ন করে তার পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারতো। কিন্তু সে যায়নি। আত্মগ্লানি এবং অনুশোচনায় হেলেন তিলে তিলে পুড়ছে। তার হৃদয়ে অসীম যন্ত্রণার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে আগুনের দাহ্যশক্তি কত প্রখর, কতটা ভয়ংকর! যার কারণে হেলেন নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উচ্চারণ করলো,

আমি সত্যিই লজ্জাহীনা, দুষ্টমনা, ঘৃণ্য এক জীব। কতইনা ভালো হতো, যদি জন্ম মুহূর্তেই প্রচন্ড ঝড়দেবতা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো এক পাহাড়ের ওপর কিংবা কোনো উত্তাল তরঙ্গসংকুল সাগরে ফেলে দিত। আহ কত ভালোইনা হতো, যদি এসব দুর্ঘটনা ঘটাবার আগেই তরঙ্গ আমাকে চিরতরে গ্রাস করে ফেলতো!

দু'টি আত্মঘাতি মৃত্যু এবং

প্রেম এবং ভালোবাসা কোনো বয়স মেপে আসেনা। যে কোনো মানুষের মনে, যে কোনো সময়েই প্রেম ভালোবাসা জন্ম নিতে পারে। প্রেম পবিত্র। আবার অনাসৃষ্টির উৎসও বটে।

দু'জন যুবক উষাকে ভালোবাসে। উষা এমন কোনো সুন্দরী মেয়ে নয়। গায়ের রঙ শ্যামলা। বেঁটে। চুলগুলো ছোট ছোট করে কাটা। চোখ মুখের চেহারাও তেমন না। তার মুখের লাবণ্য কোথাও যেন, কবে হয়তোবা সে নিজেই হারিয়ে ফেলেছে। তবু যুবক দু'জন উষাকে ভালোবাসে।

ওরা দু'জন দু'রকম করে ভাবে। আদিল ভাবে, উষা আমাকেই ভালোবাসে, সুতরাং সে কেবল আমারই।

আরেকজন ভাবে, উষা আমাকেই বেশি ভালবাসে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এসব নিয়ে মাঝে মাঝে তর্ক হয়। উষা কিছু বলে না। সে নীরব। নিশ্চুপ। পানির মতোই। যখন যে বোতলে, তখন সেই রঙের। উষা আসলে

www.pathagar.com

নিজেকে অত্যন্ত চালাক মনে করে। সে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে চায়। যার কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব সুবিধাটুকু আদায় করে নেয়।

দিন যায় মাস যায়। যুবকদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। হৃদয়ের গভীরে লুকানো পৈশাচিক প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু' জনের মধ্যে এক সন্ধ্যায় তর্ক শুরু হয়। তর্ক থেকে মারামারি, রক্তারক্তি।

একজন অন্য যুবককে গরু ছাগলের মতো করে জবাই করে দেয়। হত্যাকারী যুবক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তার জন্যে ফাঁসি অবধারিত।

রাতেই ঊষার কাছে খুনের খবর আসে। রাত আরও গভীর হয়। ঊষার চোখে ঘুম আসে না। বারান্দায় পায়চারি করে। ঘরের ভেতর চলে আসে। আলো জ্বালে। বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে, এ দু' টো তরতাজা প্রাণ শেষ হবার জন্যে কে দায়ী?

ঊষা নিশ্চুপ। তার ভেতর কোনো জবাবের স্পৃহা নেই। কিংবা আছে। যা সে উচ্চারণ করতে অক্ষম। আবার প্রশ্ন আসে, ওদের দু' জনের কাকে তুমি ভালোবাসতে?

ঊষা বিশাল আয়নার সামনে জোরে হেসে ওঠে। তাকে তখন আর সাধারণ কোনো মেয়ে বলে মনে হয় না। মনে হয় একটি ডাইনী–পুরাণের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে পৃথিবীতে নতুন করে নেমে এসেছে। আয়নায় তার চেহারা অত্যন্ত বীভৎস দেখায়। আস্তে করে একটি জবাব ভেসে আসে,

না। ওদের দু' জনের কাউকেই ভালোবাসতাম না।

উত্তরটি ছিল নিরুত্তাপ, উদ্বেগহীন।

দৃশ্য তিন্নতর

গতরাতে বাবার মৃত্যু সংবাদ এসেছে। সারা রাত চোখে ঘুম নেই। পৃথিবীর শেষ আপন মানুষটি চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সকালের প্রত্যাশায় যুবকটি প্রতীক্ষা করতে থাকে। ভাবে, অফিসে গিয়ে কিছু টাকা আর ছুটি নিয়ে বাড়িতে রওয়ানা হবে।

সকাল ন' টায় তার অফিস। সে আটটার মধ্যেই অফিসে হাজির। পিওন অবাক হয়, এত সকালে স্যার?

সে কোনো জবাব দেয়না। তার টেবিলে চলে যায়। হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে। পিওন কিছু পরে তাকে একখানা লম্বা খাম হাতে তুলে দেয়।

মতিঝিলের এক সওদাগরি অফিসে তার চাকরি। ক' দিন থেকে শ্রমিক/কর্মচারী ছাটাইয়ের পালা চলছে। শ্রমিক/কর্মচারীর কি দোষ? তলা বিহীন ঝুড়িতে যাই ভরা

www.pathagar.com

হোকনা কেন, তাই পড়ে যাবে। ঝুড়িটি বরাবর শূন্যই থেকে যাবে। যারা যোগ্য তারা ঠিকই বখরা নিয়ে রাজার হালে আছে। আর যারা বোকা, তারাই কেবল মার খেয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার এটাই নিয়ম।

বরখাস্তের খামটি হাতে নিয়ে কোথায় যাবে, যুবক কিছুক্ষণ ভাবলো।

তার বাবার মৃত্যু সংবাদ একদিকে হৃদয়ে ঝড় তুলছে। অন্যদিকে আকস্মিক তুফান। ঝড় এবং তুফানে ভাসতে ভাসতে যুবকটি রমনার একটি বেঞ্চে আশ্রয় নিল। তার এক চোখে অশ্রু, অন্য চোখে ক্রোধের আগুন।

একটি মেয়ে রিকসা থেকে পার্কে ঢুকলো। পেছন থেকে যুবকটির ঘাড়ে হাত রেখে ডাক দিল, বিপ্লব!

বিপ্লবের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তুমি এখানে?

তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। তোমার দুঃসংবাদ শুনলাম। ভাবলাম, মন খারাপ থাকলেই তুমি রমনা পার্কের এই এখানে আসো। গেলেই পাবো।

কেন এসেছো? বিপ্লব ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে। রাজিয়া সহজভাবে বলে, তোমার দুঃসময়ে আমি আসবো না? আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, বিপ্লব!

ভালোবাসার কথা শুনেই মেয়েটির গালে জোরে এক চড় বসিয়ে দেয় বিপ্লব। মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, তুমি আমাকে মারলে?

হ্যা, মারলাম।

কেন?

বিপ্লব ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে, পৃথিবীই যখন আমাকে প্রত্যাখান করলো, তখন তুমি আমাকে কেন ভালোবাসার কথা বললে?

বিপ্লব! অমনভাবে বলোনা। দেখ, ভালোবাসা আছে বলেই পৃথিবী এখনো টিকে আছে। এই ভালোবাসা এবং সৌন্দর্যই পৃথিবীকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে। বলো, প্রেম ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে কি আর অমর আছে? যখন, যেখানে প্রেম ভালোবাসার সামান্যতম ঘাটতি দেখা দেয়, তখন সেখানেই শুরু হয় দ্বন্দ্ব, সংঘাত, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ধ্বংসের খেলা। তুমি যে অনাচার, জুলুম, নির্যাতনের চিত্রটি দেখছো, অনুভব করছো, সহ্য করছো-এ সবইতো তারই প্রতিচ্ছবি। এটাকেই তুমি পৃথিবীর একমাত্র চেহারা বলে মনে করলে ভুল করবে। এটা খুব সামান্য, খুবই ক্ষুদ্র একটি চিত্র। আর ভালোবাসা? তার বিস্তৃতির কোনো তুলনা হয়না। বিশাল সমুদ্র। এই আমার চোখের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখোনা! বলো, কি দেখছো?

রাজিয়া! বিপ্লব স্ব-বিস্ময়ে রাজিয়ার চোখের দিকে তাকায়। রাজিয়ার চোখের ভেতর ভালোবাসার সমুদ্র তরঙ্গ তোলে। সমুদ্রতো কৃত্রিমতা বোঝেনা। বিপ্লব রাজিয়াকে স্পর্শ করে বলে, আসলে তুমি ঠিকই বলেছো- ভালোবাসার অসীম শক্তি।

www.pathagar.com

ভালোবাসা–মানুষকে দাঁড়াতে শেখায়। বাঁচতে শেখায়। নিজেকে সাহসী এবং বিশ্বাসী করে তোলে।

রাজিয়া হেসে ওঠে। তাই নাকি? এতক্ষণে তাহলে বুঝলে?

বিপ্লবের বুকে বাবার মৃত্যু শোক। পকেটে বরখাস্তের চিঠি। তারপরও হেসে বলে, হ্যা, তাই। তোমার ভালোবাসা পেলে, আমার বিশ্বাস–আমি আবার মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবো। মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার জন্যে চাই অফুরন্ত ভালোবাসা। তোমার ভালোবাসার কাছে আমার আত্মগ্লানি, দারিদ্র্যের লজ্জা, লাঞ্ছনা, অপমান–এ সবই তুচ্ছ। তুমি কেবল অকৃত্রিম থেকো রাজিয়া!

রাজিয়া বিপ্লবের পিঠে হাত রেখে দরদভরা কণ্ঠে বললো, আশা করি দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি ট্রয়ের হেলেন নই যে একটি নগরী ধ্বংস করে দেবো। আমি রাজিয়া। অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তবু এতটুকু বিশ্বাস করি, প্রেম ভালোবাসা কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়। এ এক মহান শক্তি। এই শক্তিতে একটি মানুষ, একটি দেশ, একটি জাতি এমন কি একটি পৃথিবী সুন্দর হয়ে, সজীব হয়ে গড়ে উঠতে পারে। বলো, পারে না?

রাজিয়ার ডান হাতটি হাতের মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বিপ্লব বললো, আমার মনে হচ্ছে, একটি অন্ধকার পৃথিবী। নিঃসীম রাত। কিন্তু রাতেরও তো শেষ থাকে। তারপর প্রভাত আসে। প্রভাতের নতুন সূর্যের আলোয় পৃথিবী আবার নতুন করে ঝলমলিয়ে হেসে ওঠে। আমার পৃথিবীতে তুমি তেমনই একটি সূর্য, রাজিয়া!

রমনার নির্জন বেঞ্চটিতে দু' জনেই ওরা একসাথে হেসে ওঠে। মাথার ওপর বকুলের ঘন পাতার আড়াল থেকে একটি পাখি ডেকে উঠে তাদেরকে যেন সমর্থন ও স্বাগত জানায়। মধুর কণ্ঠে পাখি ডাকে। কেবলই ডাকতে থাকে।

একটি ছবি এবং

একটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলামে একটি অবিস্মরণীয় ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিতে চারটি কুকুরছানা পাশাপাশি মিলেমিশে শান্তভাবে শুয়ে আছে। তাদের ভেতর কি প্রগাঢ় প্রেম এবং ভালোবাসা। ছবিটির নিচে ক্যাপশানে লেখা আছে,

এই সংঘাতময় ও সংকটপূর্ণ জীবন ও সমাজে একটু সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া প্রকৃত পক্ষেই দুষ্কর। মানুষ যখন মানুষকে জবাই করে দেয়, চোখ উপড়ে ফেলে, হত্যা করে পৈশাচিকভাবে। কিছু যৌতুকের লোভে 'প্রাণাধিক' স্বামী 'প্রিয়তমা' স্ত্রীকে খুন করে, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি চালায়–তখন মনে হয়, তাহলে বাঁচবো কি

www.pathagar.com

নিয়ে? মানবতার এই চরম অবক্ষয়ের দুর্যোগপূর্ণ দিনে পথবাসী এই চারটি কুকুরছানা হয়তো আমাদের প্রেম ভালোবাসা এবং সহানুভূতির অনেক শিক্ষাই দিতে পারে।

পাদটীকা

বিশ্বাস হচ্ছে ভালোবাসার শক্তি।

এই বিশ্বাস এবং ভালোবাসা দিয়ে একটি পৃথিবীকে নতুনভাবে, সুন্দর করে নির্মাণ করা যায়। শুধু প্রয়োজন, ভালোবাসার শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। হৃদয়কে প্রতিদিনই বারবার নাড়া দিয়ে চাঙ্গা করে তোলা। হৃদয়ের ভালোবাসার শক্তিকে উসকে দেয়া। আমরাতো মানুষ। প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া, একে অপরের সহানুভূতি ছাড়া কিভাবে মানুষ বাঁচবে? ঐযে বিখ্যাত সেই গানটি!

"মানুষ-মানুষের জন্য, জীবন-জীবনের জন্য/একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও গো বন্ধু!"....

প্রেম ভালোবাসা না থাকলে প্রকৃতি এবং পৃথিবী ভারসাম্যহীন হয়ে অতি তাড়াতাড়ি অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ১৪ আগষ্ট ১৯৯১

www.pathagar.com

ভাস্কর্যের ভাঁপ

আটই বৈশাখ। ১৪০০ সাল।

কাকতালীয়ভাবে মিলে যায় অনেক কিছু। যেমন মিলে গেল বৃদ্ধ গল্পকার মোকাম আলীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা।

তিন বছর আগে আটই বৈশাখে তার বিয়ে হয়েছিল জাহেদার সাথে। আবার রোগে ভুগে তিন বছর পর আটই বৈশাখে সে মারা গেল নিঃসন্তান অবস্থায়। তার এক বছর পর মোকাম আলী পুনরায় বিয়ে করলো জাহেদারই ছোট বোন সাদেকাকে। সেও আটই বৈশাখ।

দুই

সাদেকার সাথে আজ বাসর রাত। ফুলশয্যা। সাদেকার প্রাণে স্বপ্নের জলপ্রপাত। কিন্তু মোকাম আলী ভুলতে পারে না চার বছর আগের এই সন্ধ্যার কথা। ভুলতে পারে না জাহেদার মৃত্যুর কথা। আজ তার দ্বিতীয় বাসর রাত। স্মৃতিতাড়িত হয়ে মোকাম আলী উঠোন পেরিয়ে– সন্ধ্যার অন্ধকার চিরে চিরে এগুতে থাকলো বাড়ির উত্তর পাশের ঘাটলার দিকে। ঘাটলার কাছেই জাহেদার কবর।

তিন

সন্ধ্যার পরপরই একটা আবছা অন্ধকার নেমেছিল। এখন চাঁদের আলো ঝরে ঝরে পড়ছে। ঘাটলা এবং পাশের বাগান সে আলোতে আলোকিত। জোনাকিরা পরীর মতো দল বেঁধে নেমে নেচে নেচে খেলা করছে।

মোকাম আলী হাঁটতে হাঁটতে ঘাটলার সিঁড়িতে এসে বসে পড়লো। নির্জন–নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। ওপাশে বাঁশ বাগানের ঘন কালো ছায়ার অবয়ব। তার পাশে আম এবং নারকেলের বাগান।

www.pathagar.com

ঘাটলার সিঁড়িতে বসে মোকাম আলী তার মৃত স্ত্রী জাহেদার কথা ভাবছে। আজ তার-সাদেকার সাথে দ্বিতীয় বাসর হবে। ভাবতেই মনটা কেমন যেন হয়ে গেল মোকামের। তারপর মনটা যেন আর হৃদয়ের ভেতর থাকলো না। তারপর সে যেন কোথায় হারিয়ে যেতে থাকলো। ক্রমশ।

ঘাটলার অদূরে জাহেদার কবর। জাহেদা শুয়ে আছে সেখানে। শুয়ে আছে গ্রামের এক পুতঃপবিত্র রমণী।

মোকামের চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। সে দেখলো– বাসর রাতের সেই শাড়ি, গহনা আর মাথাভর্তি এলো চুলে জাহেদা কবর থেকে উঠে আসছে। উঠে আসছে ধীরে ধীরে তার দিকে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সন্ধ্যায় জাহেদাকে স্বর্গীয় রমণীর মতো লাগছে। বহুদিন না দেখা স্ত্রীর দিকে মোকাম তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। তার ভেতর একটা ভয়ের অজগরও হাঁটতে থাকে সমানতালে।

চার

ঘাটলার সিঁড়িতে মোকাম আলী বসেছিল। কখন যে সেখানে শুয়ে পড়েছে, সেটা সে বুঝতে পারেনি।

জাহেদা–মোকামের কাছে এসে বসলো। তার মাথায় হাত রেখে বললো, তুমি কেমন আছো?

মোকাম আলী অনুভব করলো, তার মাথায় যে হাতের স্পর্শ পড়েছে, সে যেন কোনো রমণীর হাত নয়। এত শীতল, এত সুগন্ধিযুক্ত, এত কোমল হাত কি কোনো মানবীর হতে পারে? মোকাম আলীর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটা ঢোক গিলে বললো, ভালো আছি। তোমাকে কত বছর হলো দেখিনি। তুমি কিন্তু আরো সুন্দর হয়েছো। অপূর্ব লাগছে তোমাকে।

মোকামের কথায় জাহেদা হেসে উঠলো। হাসির সাথে সাথে তার বুক এবং কোমরের ভাঁজগুলো ঢেউভাঙা সমুদ্রের মতো দুলে উঠলো। বললো, শহর থেকে কবে এলে?

এইতো গত পরশু।

আজই তো তোমার দ্বিতীয় বাসর রাত?

হ্যাঁ।

সাদেকা আমারই বোন তো, আমার চেয়েও ভালো হবে ও। তুমি সুখী হতে পারতে। কিন্তু–

www.pathagar.com

কিন্তু কি?

প্রশ্ন করতেই মোকাম দেখলো, তার সামনে জাহেদার পরিবর্তে বিশাল অগ্নিমূর্তির এক রমণী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ থেকে আগুনের হল্কা বার হচ্ছে।

পাঁচ

জাহেদা মোকাম আলীকে হাত ধরে টেনে তুলে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চললো অদৃশ্যের দিকে।

অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হলো একটি বাড়ি। সাজানো-গোছানো, ধবধবে চকচকে একটি বিশাল বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। অসংখ্য ফুলগাছ। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে বাগানটি। ফুলের মোহনীয় সৌরভে বাতাস মুখরিত। পেছনে ফলের বাগান। হাজার রকমের ফল ধরেছে সেসব গাছে।

বাড়িটিতে পা দিতেই মোকামের শরীরটা শীতল হয়ে গেল। জাহেদা মোকামের হাত ধরে নিয়ে চললো বিশাল বাগানের ভেতর দিয়ে। তারপর একটা সোনালী দরোজায় হাত রাখতেই দরোজার দু'টো কপাট দু'দিকে সরে গেল। সে মোকামকে বললো, ভেতরে এসো।

ছয়

ঘরের ভেতরটা কোমল কার্পেটে আবৃত। ঘরের চারদিকে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পোর্ট্রেট। একটা মিষ্টি-স্বর্গীয় আবহাওয়া ঘরটিকে ঘিরে রেখেছে। একটা অত্যাধুনিক চেয়ার দেখিয়ে মোকামকে বললো, বসো।

মোকাম ঘরের চারপাশ দেখছে আর অভিভূত হয়ে পড়ছে। জাহেদা এখানে থাকে! অথচ আমাদের সংসারটি ছিল কত টানাপোড়েনের। কত কষ্টের। মোকামের সামনে জাহেদা দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী। স্বর্গীয় লাবণ্যতায় তার চেহারা আরো দীপ্তিমান। বাসর রাতের কথা মনে পড়লো মোকামের। আর মনে পড়তেই তার শরীরের শিরাগুলো টনটন করে উঠলো। রক্ত চলাচল করছে দ্রুতগতিতে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন। চোখে কামনা এবং আসক্তির তন্দ্রা। হাত দু'টো বাড়িয়ে মোকাম আলী ডাকলো, জাহেদা!

www.pathagar.com

সাত

মোকামের ডাকটি জাহেদা শুনেছে বলে মনে হলো না। কোনো উত্তর না দিয়ে জাহেদাই বরং বললো– এখানে কেমন লাগছে তোমার?

খুব ভালো। এমন জায়গায় অনন্তকাল ধরে থাকতে বড় লোভ হয় জাহেদা!

তুমি সম্ভবত সেটা পারবে না। এমনকি এখানে ডেকে আনার প্রয়োজনীয়তাটুকু শেষ হলেই তোমাকে চলে যেতে হবে। জাহেদা বললো।

প্রয়োজন? মোকামের কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ, তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল। এসেছ যখন ভালই করেছো। তারপর একটা দম ফেলে জাহেদা বললো– আমার খবরাখবর তুমি রাখতে পার না। সেটা তোমার পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু আমি রাখি। এই যেমন– তুমি কি খাচ্ছো, কি করছো, কি লিখছো– সব, সবই আমি দেখি এবং জানি।

জানো? আমার এবারের লেখাগুলোও তুমি দেখেছো? জানো, তোমাকে নিয়ে এবার একটা গল্প লিখেছি। দেখেছো সেটা? আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল মোকাম আলী।

হ্যাঁ, দেখেছি। আমাদের বাসর রাতের কথা লিখেছো। কিন্তু মিথ্যা বলেছো অনেক। তুমি কি জানো, মানুষ মূলত মরে না! সুতরাং তাদেরকে নিয়ে কোনোরকম মিথ্যা–বানোয়াট গল্প–কাহিনী চলে না!

মোকাম অবাক–বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো– কেন গল্পটির মধ্যে মিথ্যার কি ছিল? তোমাকে ভালোবেসেই তো লিখেছি।

জাহেদা পুনরায় অগ্নিমূর্তিতে রূপান্তরিত হলো। বললো, তোমার ভালোবাসাটি পাঠকের কাছে ঘৃণার দাবানল হয়ে উঠতে পারে। ভালোবাসার নামে আমাকে তুমি অপমান করেছো!

কিভাবে?

জাহেদা বললো, বাসর রাতে তুমিই আমাকে জোরপূর্বক বস্ত্রহরণ করেছিলে। তারপর আমার ইচ্ছের তোয়াক্কা না করে তুমি তোমার কামনা চরিতার্থ করেছিলে। মনে আছে, মনে আছে তোমার– সে রাতে ভয়ে আর আতংকে আমার ঘুম হয়নি! অথচ কি আশ্চর্য, কুৎসিত মিথ্যা কথাটিই লিখলে। লিখেছো, আমিই নাকি আমার যাবতীয় আচ্ছাদন একে একে খুলে নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করেছিলাম। আমার স্তনে তোমার স্পর্শ পড়লে শিউরে উঠেছিলাম। ছি! লজ্জা আর ঘৃণায় শরীর জ্বলে যায়। কবরেও তুমি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না! তোমার গল্পটি যেই পড়বে, সেই ভাববে– আমি ছিলাম কামাতুর ডাকিনী। ভাববে, উলঙ্গ এক রমণী, যে রিপুর তাড়নায় উন্মাদিনী ছিল। সে রাতে আমার সাথে যে ব্যবহার তুমি করেছিলে, আজকের

www.pathagar.com

রাতে সাদেকার সাথেও ঐ একই ব্যবহার করবে নিশ্চয়ই! জাহেদা ঘরের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে তারপর বললো, পৃথিবীতে নারী-পুরুষের মিলন অবধারিত সত্য। যে সত্যের কাছে সমর্পিত হয় পৃথিবীর মানব-মানবীরা। সত্যের গভীরে আরো অনেক সত্য আছে। কিন্তু মানবিক আচরণের সবকিছু কি উল্লেখ করা যায়? নাকি কেউ করতে পারে?

আট

আলোকিত ঘরটিতে পায়চারি করতে করতে জাহেদা বললো, তুমি কথাশিল্পী। গল্প বানানো তোমার কাজ। তুবও সামান্যতম মার্জিত রুচির পরিচয় কি তুমি দিতে পার না? মানুষের যাবতীয় কর্মের যদি হিসাব হয়, তাহলে তোমার কর্মেরও হিসাব হবে। তখন কি জবাব দেবে? একজন মৃত নারীকে এভাবে উলঙ্গ করতে তোমার রুচিতে এতটুকুও বাঁধলো না!

ধরা গলায় মোকাম বললো- বিশ্বাস করো জাহেদা, তোমাকে অসম্মান করার জন্যে আমি লিখিনি। আসলে ওর ভেতর দিয়ে একটা দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম।

জাহেদা সজোরে হেসে উঠলো। চমৎকার তোমার দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার পটভূমি। ভালো দু'টো শব্দকে রপ্ত করেছ গল্পকার! যৌনতার মধ্যে দর্শন! আধ্যাত্মিকতা! চমৎকার! আল্লাহর পৃথিবীতে এত রহস্য, এত দৃশ্য, এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাদান, এত কিছু থাকতে তুমি কেবল দর্শন খুঁজে পাও নারীর গোপন অঙ্গে! তাদের শরীরের ভাঁজে ভাঁজেই কেবল তুমি খুঁজে পাও আধ্যাত্মিকতা! আসলে তুমি একটা জাহান্নামের কীট! দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার নামে তুমি কেবল তোমার রুচিহীন কামনা-বাসনারই উপাসনা কর।

একটা ভারি দম ফেলে জাহেদা বললো- তবু ভালো, তোমার দেশের বারোআনা লোক লেখাপড়াই জানে না। আর যে চারআনা লোক পড়তে পারে, তারাও সবাই তোমার এ লেখা পড়বে না। কিন্তু তুমি যা লিখেছ, তার শাস্তিটি হবে অনেক ভয়ংকর। অনেক কঠিন। তার জন্যে প্রস্তুত হও মোকাম!

মোকাম আলী শিউরে উঠলো। শাস্তি? তুমি আমাকে না অনেক ভালোবাসতে? তুমি কি আমাকে শাস্তি দিতে পারবে, জাহেদা!

খবরদার! তোমার ঐ অপবিত্র মুখে আমাকে আর নাম ধরে ডাকবে না। আর কখনোই আমার নামটি তোমার জিহ্বার ডগায় আনবে না। আমি তোমার কেউ নই।

www.pathagar.com

আমি জাহেদা। অনেক-অনেক দূরের এক অধিবাসিনী। তুমি ভুলে যাও, আমি একদিন তোমার স্ত্রী ছিলাম। ভুলে যাও এবং এখন এসো আমার সাথে।

নয়

মোকামকে নিয়ে জাহেদা পাশের আর একটি ঘরের দিকে গেল। দরোজায় হাত রাখতেই দরোজার কপাট দু'দিকে সরে গেল। জাহেদা বললো, ঘরের ভেতর প্রবেশ করো মোকাম!

মোকাম ঘরের ভেতর প্রবেশ করে অভিভূত হয়ে গেল। এমন সুদৃশ্য-চমৎকার ঘর সে জীবনে আর কখনো দেখেনি। বললো, এটাও কি তোমার?

হ্যাঁ! এটাও আমার ঘর। আর ঐ যে দেয়ালে কালো পর্দা দেখতে পাচ্ছো, ওর পেছনেই রয়েছে তোমার যোগ্য পুরস্কার। যোগ্য সম্মান।

পুরস্কার? এসব কি বলছো তুমি?

হ্যাঁ। পুরস্কারই তো! তুমি যা লিখেছো এবং যেসব লিখবে, আরো যত নারীর বস্ত্রহরণ করবে- তার চেয়েও তোমার এ পুরস্কারটি হবে ভয়ংকর!

মোকাম আস্তে করে বললো- কালো পর্দার আড়ালে কি আছে?

জাহেদা বললো-একটি পাথর খোদাই করা পূর্ণাঙ্গ ভাস্কর্য।

কার? কে তৈরি করেছে?

আমিই। তোমার বস্ত্রহরণের গল্পটি দেখার পর এটা খোদাই করেছি। তোমার গল্পটি ছাপা হয়েছে কাগজে। যারা পড়বে, তারা একদিন ভুলে যাবে। তাদের হৃদয় থেকে মুছে যাবে একদিন তোমার কুৎসিত লেখার বর্ণগুলো। কিন্তু আমি যে ভাস্কর্যটি তৈরি করেছি, তা পাথর খোদাই করে। একটি নয়, এ থেকে আরও ভাস্কর্য তৈরি করা হবে। পৃথিবীর প্রতিটি শহরে, বন্দরে, রাজপথে, গ্রামে-গঞ্জে, সমুদ্রে, অরণ্যে- সব, সবখানেই টাঙিয়ে দেয়া হবে ঐ বিশাল ভাস্কর্য এবং তার সাথে থাকবে পরিচিতিমূলক ক্যাপশান।

মোকাম আলী বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে জাহেদার দিকে। বললো, আশ্চর্য! তুমি তৈরি করেছ? তুমি না মৃত? তুমি তো পড়তেই জানতে না। ভাস্কর্য খোদাই করতে শিখলে কিভাবে?

জাহেদার কণ্ঠ দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটছে। বললো, সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?

না, তা বলছিনে। তবে তো ভালই হলো। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হলে। অবশ্য

www.pathagar.com

আমি কথাশিল্পী আর তুমি ভাস্কর!

প্রতিদ্বন্দ্বী! কে কার প্রতিদ্বন্দ্বী?

কেন আমার?

জাহেদা এমনভাবে তাকালো মোকামের দিকে যে, মোকাম আবারও ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর জাহেদা দ্রুতগতিতে দেয়ালের দিকে গেল। কালো পর্দাটি হেঁচকা টানে নামিয়ে ফেললো দেয়াল থেকে। অবাক বিস্ময়ে মোকাম দেখলো, তার সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ- নিখুঁতভাবে অবিকৃত অবস্থায় পাথরের ওপর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। তার শরীরের শিরা-উপশিরা, পুরুষাঙ্গ, ঘন কৃষ্ণদাম- সব, সবই অকৃত্রিম, জীবন্ত। নিজেরই নগ্ন ভাস্কর্য! এক নজর দেখেই মোকাম চোখ বন্ধ করলো। তার চোখের ভেতর কে যেন শিসা গরম করে ঢেলে দিচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে দু' চোখ। কানের ভেতর উত্তপ্ত লোহার দন্ড কে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে, পুনরায় হেঁচকা টানে বার করে আনছে। আর হৃদয়ের ভেতর কে যেন বিষাক্ত বর্ষার ফলা ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আয়েশের সাথে ঘোরাচ্ছে।

মোকামের দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। ভয়ে, আতংকে, লজ্জায় আর ঘৃণায়। অতি কষ্টে সে কেবল উচ্চারণ করলো, আহ্! .....

দশ

মোকামের আহ্ শব্দের সাথে সাথে হেসে উঠলো জাহেদা। বললো, খুব খারাপ লাগছে গল্পকার! খারাপ লাগলেও এটা সত্য ভাস্কর্য। এটা তোমারই নগ্ন দেহের ভাস্কর্য। তুমি তো মিথ্যার অন্ধকারে মেয়ে মানুষের বস্ত্র হরণ কর। বানিয়ে বানিয়ে। আর আমি বস্ত্র হরণ করলাম সত্য সত্য। কোনো মানুষের নয়- একজন ভন্ড কামুক, ভন্ড তাপসের। এটা পৃথিবীর অলিতে গলিতে ফেরাউনের লাশের মতো ঝুলিয়ে রাখা হবে। পৃথিবীতে যারা আছে, যারা আসবে কেয়ামত পর্যন্ত, তারা সবাই দেখবে এই নগ্ন ভাস্কর্য। দেখবে আর ক্যাপশান পড়ে বুঝবে তোমাকে। বুঝবে, মিথ্যার কি পরিণাম!

এখন ১৪০০ সাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী আসবে আর যাবে, কিন্তু তোমার এই নগ্ন ভাস্কর্যটি থাকবে অমলিন, অক্ষয়। কালের বিচারে লেখা হয়ে গেছে তোমার জন্যে এই চরমতম লাঞ্ছনার গ্লানি।

ভয়ে মোকাম কাঁপতে থাকলো। কাঁপতে কাঁপতে সে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তার মনে হলো, সে তলিয়ে যাচ্ছে কোনো এক অভিশপ্ত গুহার ভেতর। প্রাণপনে সে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। তার শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে।

একসময় মোকাম দেখলো, তার নিজের বিশাল নগ্ন দেহের ভাস্কর্যের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে সে বিবস্ত্র অবস্থায়। অসহায়ভাবে দেখছে মোকাম- নিজেরই নগ্ন দেহের বিশুদ্ধ লাঞ্ছনা। দেখছে আর অনুভব করছে, নগ্ন ভাস্কর্য থেকে একটা উত্তপ্ত ভাঁপ সাপের জিহ্বার মতো বার হয়ে আসছে এবং সেই ভাঁপে তার শরীরের মাংস, চামড়া, হাড়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বরফের মতো কেবলই গলে গলে পড়ছে।

নতুন ঢাকা ডাইজেস্টঃ,আগস্ট ১৯৯৩

www.pathagar.com

টোকা

ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠাটি বাতাসে উল্টে গেল।

উল্টে যাবার সাথে সাথে দগদগে ক্ষতের মতো ভেসে উঠলো আর একটি পৃষ্ঠা। ১৪০০ সাল। আর একটি শতাব্দীর পিঠের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছেন আসিফ আদনান।

শতাব্দীর কথা মনে হতেই তিনি আমূল চমকে উঠলেন। বয়স কত হলো? ষাট পেরিয়ে আরও কিছুটা বাড়তি সম্ভবত। এখন আর বয়সের হিসাব রাখার কোনো প্রয়োজন হয়না। যেমন হিসাবের প্রয়োজন হয়না বৃক্ষের বয়সী পাতাটির। সেতো কেবল প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে। গুণতে গুণতে সন্ধ্যা করে। রাত জাগে। ভোর হয়। পুনরায় প্রতীক্ষার পালা।

এক শতাব্দী আগে কোথায় ছিলাম? কোন্ মহাশূন্যে? কোন্ গ্রহের বাড়িতে? আদনান অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে নির্ঘুম চোখে নিজেকেই প্রশ্ন করেন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসে। দু' চোখের পাতার ওপর দিয়ে তারা হাঁটে। খেলা করে। তারপর ডানা মেলে সারা ঘরে উড়ে উড়ে পাক খায়।

মাকড়সার জালের ভেতর একটি ঝিঁঝি পোকা আটকে পড়েছে। ঠিক যেমন বাংলাদেশ নামের এই ভূখন্ডটি ভারতের জালে আবদ্ধ। অসহায় ইঁদুরের মতো যেমন বাংলাদেশ যাঁতাকলের ভেতর ছটফট করছে, ঠিক তেমনি ঝিঁঝি পোকাটিও মাকড়সার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পোকাটি কি আর কোনোদিন সূর্যের আলো পাবে? বাতাস পাবে? প্রভাতের বয়স পাবে? আদনান প্রশ্নের সমুদ্রে তলিয়ে যেতে থাকে। ক্রমশ।

জবাব আসে না।

স্মৃতির ভারে তিনি আরও চোরাবালির গভীরে নেমে যান। অনেক-অনেক গভীরে।

একটি পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশুকে তিনি হাঁটতে দেখেন। শিশুটি উলঙ্গ। কোমরে গামছা বাঁধা। মাথায় মাথালি। সামনে দশটি খাসি। পাঁচটি গাভী। হাতে বাঁশের লাঠি।

www.pathagar.com

দু' পাশে ধান ক্ষেত। দক্ষিণে এদোর বিল। উত্তরে নোচুরকুড়। ছেলেটির কোমরে গামছা বাঁধা। উলঙ্গ। এটাও খেলা। পাঁচ বছর বয়সের খেলা। ওসমান চাচা সাথে আছে। ছেলেটির তবু লজ্জা করছেনা। আসলে লজ্জা পাবার মতো ছেলেটির শরীরে তেমন কোনো ভার ভারিক্কি আসেনি। পূবের মাঠে তারপর সারাদিন ছুটে ছুটে খেলা। সন্ধ্যা ধেই ধেই করে তেড়ে আসে। ওসমান চাচা গরুছাগল তাড়াতে তাড়াতে হাঁক দেয়, তাড়াতাড়ি চল্। সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেল! খেলা শেষ।

সন্ধ্যা নামলে আর খেলা থাকে না। তখন দুনিয়াটাই কেমন গোরের মতো অন্ধকার। জ্বলন্ত ইটের পাঁজার মতো থমথমে।

উলঙ্গ শিশুটি এখন আর ন্যাংটো হবার বয়স ফিরে পায় না। ফিরে পায়না রাবেয়া, সখিনা আর আমেনার সাথে যখন তখন আম বাগানে ছুটে যাবার বয়স। ফিরে পায়না শেষ রাতে তাল কুড়োবার বয়স। ধান কুড়োবার বয়স। ইচ্ছে হলেই আর কান্নার বয়স থাকলো না। শিশুটির শরীর থেকে ঝরে পড়ে গেল স্বর্গীয় প্রচ্ছদ। তরঙ্গের বিপরীতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে হাঁপাচ্ছে সে। তার বুকের পাঁজরগুলো বাদুড়ের ডানার মতো ভাঙছে ক্রমাগত। কামারশালার হাঁপরের মতো কেবলই ওঠা নামা করছে। কেবলই। তবুও তল পাচ্ছে না সে। পাচ্ছে না তীরের স্পর্শ। মাটির গন্ধ। সময়, সংসার, দেশ, মহাদেশের মতো ভাঙছে সে অবিরত। ভাঙছে , কিন্তু নিঃশেষ হচ্ছে না। এই অবিশ্রান্ত সাঁতরানোর শেষ কোথায়? প্রশ্নটি মৃত মাছের মতো টান টান ভাবে পড়ে থাকে তার বালিশের পাশে।

বাতাস যেন কারামুক্ত হয়ে এইমাত্র শহরে পা রাখলো। প্রচন্ড তার গতিবেগ। তাকে যেন অন্যায়ভাবে সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়েছিল। কারামুক্ত বাতাস এখন শো শো করে তার ক্ষোভ আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। সে কি নালিশ জানিয়েছে মেঘের কাছে? মেঘের প্রচন্ড গোঙানিতে মৃত্তিকা কম্পমান।

এই ঘনঘোর আবহাওয়ার মধ্যে দরোজায় টোকা পড়লো। এক দুই তিন। তারপর শব্দটি থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার টোকা পড়লো। ধীরে ধীরে। এক দুই তিন। তারপর ক্রমাগত খট খট খট। টোকার শব্দ।

কে?

আদনান বালিশে মাথা রেখেই জিজ্ঞেস করেন।

শব্দটি থেমে গেল। কিন্তু শায়িত আদনানের ভেতর শব্দটি বারবার ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে।

www.pathagar.com

কে? কে? কে?

কোনো জবাব নেই।

আদনান বালিশ থেকে মাথাটা থান ইটের মতো ধাক্কা মেরে তুলে ফেললেন। রাত কয়টা বাজে?

ঘরময় অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতর তিনি সময়কে খুঁজে পেলেন না। বালিশের চারপাশ হাতড়াতে হাতড়াতে কেবল তিনি অনুভব করলেন–গ্লাসের অতিরিক্ত পানির মতো উপচে পড়ছে তার কম্পমান হৃদয়ের আতংক।

তিনি পুনরায় দেহটাকে কাঁথার ভেতর ঢোকাতে চেষ্টা করলেন। নিজেরই দেহ। ষাটের অধিক পর্যন্ত তিনি এটাকে বহন করে আসছেন। কোনোদিন ভারি বলে মনে হয়নি। এমনকি ঝমাঝম বৃষ্টিতে দাড়টানার সময়ও না। গোয়ার ষাঁড়কে বাগে আনার মতো কৌশলে তিনি দেহটাকে কাঁথার ভেতর ঢুকালেন। তারপর সাপুড়ে যেভাবে অবাধ্য সাপটাকে ঝাঁপির ভেতর ঢুকিয়ে ডালার মুখ বন্ধ করে দেয়, ঠিক তেমনি নিজের মুখের ওপর কাঁথার অগ্রভাগ টেনে দিলেন। তবু ভয় নামক সাপটি এখনো তার বুকের ভেতর ফোঁস ফোঁস করে শব্দ তুলছে।

ঘেমে যাচ্ছেন আদনান। বালিশ, খাট, কাঁথা, ঘর–এমনকি তার নিজের দেহটাও তার সাথে অসহযোগিতা করছে। তারা যেন উপহাস করছে দুঃসময়ের কৌতুকপ্রিয় বন্ধুদের মতো।

ভয়গুলো আরও বীভৎস হয়ে তার চোখের সামনে দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছে। পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশুর শিশ্নাঙ্গে টোকা দিয়ে খেলা দেখছে যেন তালাকপ্রাপ্তা কাকলির মা। আদনানের চোখ থেকে বাষ্পের মতো উড়ে গেছে ঘুম। হারিয়ে গেছে প্রশান্তির আরাম। যেমন হারিয়েছে বিছানায় পেচ্ছাব করার স্বাধীনতা। যখন তখন কাপড় খুলে পুকুরে ঝাঁপ দেবার অবাধ বয়স।

দরোজায় পুনরায় টোকা পড়লো। শব্দটি ইস্পাতের তলোয়ারের মতো। ইলেকট্রিক করাতের মতো। নিমিষেই দু' ভাগ। তিন ভাগ। চারভাগ। তারপর সব শেষ। তারপর কেবলই তুষ। কেবলই রক্ত। রক্ত কিংবা কাঠের তুষ। তুষ কিংবা রক্ত।

কে? কে?

শব্দটি থেমে গেল।

পুনরায় টোকা পড়লো।

কে? কে?

www.pathagar.com

বলতে বলতে আদনান শরীর থেকে কাঁথা ফেলে দিলেন। তারপর যৌবনের প্রথম দ্বিধা, সংকোচ এবং ভয়কে ঝেড়ে ফেলে সাহসী হবার মতো করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাম হাতে কোমরে নেতিয়ে পড়া লুঙ্গির গিট। দরোজার দিকে পা ফেলতে ফেলতে আবারও বললেন, কে কে?

কারুর কোনো শব্দ নেই।

দরোজা খুলে, দরোজার দু'টো পাট দু'দিকে ফাঁক করে ধরলেন। মাঝখান দিয়ে সাপের জিহবার মতো মুখ বাড়িয়ে বললেন– কে কে?

তিনি কোনো মানুষের সাক্ষাত পেলেন না। না কোনো জীব জানোয়ারের। কেবল অনুভব করলেন– খোলা দরোজা দিয়ে এক মুঠো ভারি বাতাস চাঁদাবাজ মাস্তানের মতো ঘরে প্রবেশ করলো। বাতাসের শরীরে কেমন পচা লাশের মতো গন্ধ। গন্ধটি ডাইনীর মতো হাসতে হাসতে আদনানের নাকের ভেতর ঢুকে গেল। এবং যাদুর মন্ত্রের মতো তাকে অবশ করে ফেললো।

আদনান পড়ে আছেন। যেন শুয়ে আছে পাঁচ মাসের শিশু জরিনার কোলের ওপর। চুক চুক করে দুধ টানছে। জরিনা বেগম শিশুর উরুতে হাত ঘষতে ঘষতে এগিয়ে দিচ্ছেন বাম স্তনের বোঁটা। বিষম খেল শিশু । তার মাথায় হাত দিয়ে আয় আয় করে চুপ করাচ্ছেন জরিনা বেগম। তারপর স্তনের ওপর ব্লাউজ এবং শাড়ি তুলে দিয়ে ছড়া কেটে কেটে ঘুম পাড়াচ্ছেন তিনি। শিশুটি ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ঘুমের রাজ্যে উড়ে যাচ্ছে পাঁচ মাসের শিশু। উড়ে যাচ্ছে।.....

মানুষের চোখ অকেজো হয়ে পড়লেও মন সজাগ থাকে। সজাগ থাকে সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো আত্মা। আত্মার কোনো মৃত্যু নেই।

আদনানের নাকের ভেতর পচা লাশের গন্ধ ঢুকে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ঘন্টাধ্বনি বাজিয়ে দিয়েছে। সে দেখছে যুদ্ধাহতরা আসছে। আনছে বহন করে পিঁপড়েরা নিহতদের লাশ। লাশগুলির শরীর থেকে মাংস, চামড়া, হাড় হাড্ডি খসে খসে পড়ছে। তারপর কেবল কংকাল। কংকাল আর কংকাল। কংকালের সাথে আদনানের কথোপকথন হচ্ছে,

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

পৃথিবীতে।

তোমাদের পরিচয়?

মানুষ।

তোমরা কিভাবে মরলে?

www.pathagar.com

আমরা মরিনি! না! আমরা মরিনি!

কংকালগুলোকে আদনান নেড়েচেড়ে দেখে। তারা নারী না পুরুষ বোঝার মতো কোনো চিহ্ন তাদের শরীরে অবশিষ্ট নেই। নারী না পুরুষ তার হিসাবের কোনো প্রয়োজন নেই। লাশ-লাশই। কংকাল-কংকালই। তাদের দিকে এক পলকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তাকাতে তাকাতে তিনিও যেন এক সময় তাদের গোত্রভুক্ত হয়ে যান। হৃদয়ের ভেতর টোকা পড়ে।কে, কে? বলে আদনান প্রশ্ন করতেই দেখেন, প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং তিনি।

গোঁয়ার বাতাস বয়ে যাচ্ছে শা-শা। মেঘের রাজ্যে তান্ডব যুদ্ধ। মহাপৃথিবীর মতো অশান্ত প্রকৃতি। মড়মড় করে শব্দ হলো। কোথাও বুঝি ভেঙে পড়লো প্রবীণ বৃক্ষের বয়স। ভেঙে পড়লো! হারিয়ে গেল একটি শতাব্দীর ছায়াচিহ্ন!

আদনানের হৃদয় চুম্বকের মতো স্পর্শ কাতর। শব্দ হচ্ছে মড়মড়। দূরে, বহু দূরে শব্দ হচ্ছে ঠকাঠক্। ঠকাঠক্। শব্দগুলো ভেসে আসছে দ্রুত। দুঃসংবাদ বহনকারী মাতাল বাতাসের চেয়েও দ্রুত। আদনান পড়ে আছে বয়স্ক গরুর মতো। তেপান্তর মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ। একা। হালের অযোগ্য। শীর্ণকায়। চাষী তবু লেজের গোড়ায় লাঠি ঢুকিয়ে চাপ দিচ্ছে, ওঠ্ ওঠ্। আর মাত্র এক বিঘা। জোয়াল টান্। তার পাঁজরে লাঠির গুঁতো দিয়ে টোকা দিচ্ছে চাষী। ওঠ্ ওঠ্। আর মাত্র এক বিঘা। বৃদ্ধ গরু অসহায়ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মনিবের দিকে। তার চোখে সমুদ্র নামতে পারতো। কিন্তু হায়! সেখানে তো পানি নেই। বৃদ্ধ গরু কাত হয়ে পড়ে থাকে সাপের খোলসের মতো। পড়ে থাকে আর শোনে মনিবের হুংকার, অপদার্থ জানোয়ার! তোর জন্যে হারাম হলো আজ থেকে আমার খড়-বিচালি। তোর মাংস আজ হালাল হলো কাক-শকুন আর শিয়ালের জন্যে। ওঠ্ ওঠ্।...

আদনানের হৃদয়ে কামানের শব্দের মতো বেজে ওঠে টোকার শব্দ। খট্ খট্ খট্। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কিসের টোকা? কে কাটছে? কি কাটছে? সময়, বয়স, জীবন, দেশ, মহাদেশ, মহাকাল নাকি মহাপৃথিবী?

প্রতি রাতে, রাতের গভীরে বৃদ্ধ প্রহরী এলাকাবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে যান, মহল্লাবাসী- হুশিয়ার, সাবধান! .... আজ এত শব্দ কানে আসছে, কিন্তু বৃদ্ধ প্রহরীর সে সাবধান বাণী আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু কেন?

www.pathagar.com

টোকা পড়ছে বার বার। ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে বার বার। ভেঙে যাচ্ছে বয়স্ক বৃক্ষের বয়স। ভেঙে যাচ্ছে মহাকালের ঢেউ। শতাব্দীর আগে আমি কোথায় ছিলাম? এই শতাব্দীর পর আমি কোথায় যাবো? তারপর? তারপর? তারপর?.....

অসংখ্য প্রশ্নের ওপর দিয়ে কেমন নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে গরু আর ছাগল দাবড়িয়ে মাঠের দিকে হেঁটে যাচ্ছে পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশু। কোমরে গামছা বাঁধা। বগলে বাঁশের লাঠি। সামনে তেপান্তর। পেছনে অন্ধকারের ব–দ্বীপ।

সন্ধ্যা নেমে এলো ধীরে ধীরে। পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশুর খেলা শেষ। সন্ধ্যা নেমে এলে আর খেলা হয় না। ধেই ধেই করে অন্ধকার নেচে নেচে গ্রাস করলো বিস্তীর্ণ মাঠ। সামনে তেপান্তর। পেছনে অন্ধকারের ব–দ্বীপ।

ওগো কে যাও লণ্ঠন হাতে, লাঠি ফেলে ফেলে– ঠক্ ঠক্ ঠক্! আমাকে সাথে নিয়ে চলো। পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি বাড়ি যাবো। সন্ধ্যা নেমে এসেছে, সন্ধ্যা।.....

বলতে বলতে আর একটি ভয়ংকর শতাব্দীর জিহ্বার ভেতর ঢুকে পড়লেন আসিফ আদনান।

অঙ্গীকার ডাইজেস্ট, জুলাই ১৯৯৩

www.pathagar.com

মথিত মাস্তুল

অফিসে বসতে না বসতেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

হ্যালো। .....

জ্বী, সাগর বলছি। কে বলছেন, কোথা থেকে?

আমাকে চিনতে পারলেন না?

না, মানে ঠিক মনে করতে পারছিনে।

ও, তাই বুঝি!

ফোনের ও প্রান্ত থেকে একটি প্রচন্ড হাসির শব্দ ভেসে এলো এবং তার সে শব্দ যেন আমার চেয়ার টেবিল দেয়াল এমনকি ক্রমান্বয়ে সারা অফিস কক্ষে কাঁসার পাত্র আছড়ে পড়ার মতো ঝনঝন করে বেজে উঠলো। হ্যালো, হ্যালো বলে আমি তার নাম জিজ্ঞেস করতেই ফোনের লাইনটা অকস্মাৎ কেটে গেল।

দুই

সেদিন, কথা বলার মাঝখানে ফোনের লাইনটা কেটে যাবার পর স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলাম, সে বোধ হয় আবার রিং করবে। কিন্তু করেনি। এমনকি গত দু' দিনেও না।

এভাবে তিনদিন কেটে গেল।

আজ অফিসের কাজ সেরে একটু অবসর নিচ্ছি। বেশ ক্লান্ত। তবুও সেদিনের আকস্মিক এবং আশ্চর্যজনক ফোনের কথা আমার মনে পড়লো। বিষয়টি নিয়ে ভাবছি, এমন সময় ফোনটি বেজে উঠলো।

হ্যালো। .....

জ্বী, সাগর বলছি।

ও, সাগর ভাই তাহলে? কেমন আছেন?

বললাম, ভালো। আপনি কে বলছেন? কোথা থেকে?

www.pathagar.com

সে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে একটি সরল হাসির ধ্বনি তুলে বললো, দেখুন না কি কান্ড, সেদিন কথা শেষ না হতেই লাইনটা কেটে গেল। তারপর বলুন, আপনার খবরাখবর কি?

ও প্রান্তের কন্ঠটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আর একজন অপরিচিত মানুষের সাথে কি কথাই বা বলা যায়? তাকে কি বলা যায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা কিংবা আন্তর্জাতিক সমস্যার কথা! সে তার পরিচয় দিচ্ছে না অথচ আমার খবরাখবর জানতে চায়। এ অবস্থায় যে কোনো মানুষই বিব্রত না হয়ে পারে না। তবু ভদ্রতা বলে কথা। তাকে বললাম, এই তো চলছে কোনোরকম। আপনার খবর কি?

আমি?

ও প্রান্ত থেকে একটি বিস্ময়কর শব্দ ভেসে এলো। তার সে শব্দের ভেতর কোথাও যেন একটি চাপা ক্ষোভ বা অভিমানের বিষবাষ্প লুকিয়ে ছিল। সুযোগ পেয়ে সেটা বেরিয়ে এলো। সম্ভবত সে খুব চালাক। দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললো,

আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?

বললাম, কেন?

ও প্রান্ত থেকে শান্ত গলার ধ্বনি ভেসে এলো, ব্যস্ত না থাকলে অপনাকে একটি কবিতা শোনাই। আমার খুব প্রিয় কবিতা। আশা করি আপনারও ভালো লাগবে।

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন– যার সাথে দেখা নেই, জানা নেই, বোঝা নেই, সে আমাকে কবিতা শোনাতে চায়। তাও আবার অফিস টাইমে, টেলিফোনে!

অফিসটা তো প্রেম কিংবা ফাজলামো করার জায়গা নয়!

তবু একজন ভদ্র মানুষকে অপমান করা আমার বিবেকে বাধলো। কিছুটা বিরক্তির সাথে বললাম,

কবিতা শোনা যাবে। কিন্তু তার আগে আপনার পরিচয়টা দিলে খুশি হবো।

সে মৃদু হেসে বললো, আলাপ যখন শুরু হয়েছে, তখন পরিচয় হয়তোবা পাবেন। কিন্তু সেটা পরে হলেও দোষের কিছু নেই। কবিতাটি আগে শুনুন তো!

বললাম, শোনান।

ও প্রান্ত থেকে সে বললো, এখন তো লাঞ্চ আওয়ার। হাতে কাজ থাকার কথা নয়। তাই আপনাকে একটু বিরক্ত করছি। কিছু মনে করছেন না তো?

কিছু মনে করলেও তো আর বলা যায় না। তাকে বললাম, না। কিছু মনে করছিনে, আপনি কবিতা শোনাতে পারেন।

www.pathagar.com

সে কবিতা পড়া শুরু করলো। খুব ধীরে ধীরে। শুদ্ধ উচ্চারণে। তার সুন্দর আবৃত্তিতে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু তার চেয়েও অবাক হলাম অনেক বেশি। তার কবিতাটি ছিল এরকমঃ

"এক দুই করে চলে গেল অবাধ্য প্রহর
ক্ষয়ে গেল বয়সের আর একটি ধাপ
গোধূলি সময়ে দাঁড়িয়ে আছি
সাগর কিণারে নির্বাক
ঘড়ির দ্রুততা বাড়লো
হৃদয়ের চঞ্চলতা বাড়লো
চোখের প্রিজমে ভেসে ওঠে নৈরাশ্য ধোঁয়া
এক সময় সূর্য হারালো তেজসদ্যুতি
মুহূতেই বেজে উঠলো সতর্ক ধ্বনি
অবাক বলাকারা বিস্ময়ে নিশ্চুপ
আর এদিকে আমি
আঁধার কুয়াশায় শামুকের কাছে
ঝিনুকের কাছে
জিজ্ঞেস করলাম শরাহত বুকে;
বলো তো 'মুক্তা' কোথায়?
সাফল্য জীবনের জন্যে আমার
ভীষণ প্রয়োজন 'মুক্তার'।"

তিন

কবিতা পড়া শেষ করে সে জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো?

আমার কণ্ঠে তখন চৈত্রের তাতানো দুপুর। আমি আর কি জবাব দেব? আমার বুকের ভেতর একটা প্রচন্ড ঝড় উথলে উঠে আমাকে তখন কেবলই অবিন্যস্ত ও অশান্ত করে তুলছে। কারণ, যে কবিতাটি এইমাত্র শুনলাম– সেটা আমারই লেখা এবং বহুদিন আগে। বাঙালী ছেলেমেয়েরা যে বয়সে প্রেমের পাঠ শেখে এবং যে পাঠের অনুষঙ্গে সবাই কমবেশি কবি হয়ে যায়, ঠিক তেমনি এক সময়ে বহুদূরের, বাংলাদেশের অন্য এক প্রান্তের 'মুক্তা' নামের একটি মেয়ের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে

www.pathagar.com

যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। সেই সময়ে আবেগ বশত কবিতাটি লিখে তার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

এর মধ্যে বহু বছর পার হয়ে গেছে। প্রায় একটি যুগ। তার অবস্থান থেকে আমার দূরত্ব কয়েক শো মাইলের। সুতরাং সাক্ষাতের তো প্রশ্নই ওঠে না। এক সময়, কালের নিষ্ঠুর থাবায় আমরা দু'জন সেই চিঠিপত্রের যোগাযোগ থেকেও ছিটকে পড়ে গেছি বহু দূরে।

এতগুলো বছর পর, কত অসম্ভব স্মৃতিই তো মানুষের হৃদয় থেকে মুছে গেছে। মুছে যায় প্রচন্ড ব্যথা, কষ্ট, যন্ত্রণা স্মৃতি। পাল্টে যায় পরিবেশ পরিস্থিতি। সময়ের শরীরে ধারন করে অন্যরকম আবরণ। যেখানে অনেক বড় কিছুও ম্লান হয়ে যায় দিন বদলের সাথে সাথে, সেখানে এই সামান্য স্মৃতিটুকু কিভাবে উসকে উঠলো? ভাবতেও অবাক হতে হয়।

আমার কোনো জবাব না পেয়ে সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, কি হলো একটা কিছু বলুন!

আমি নিজেকে সংযত করে বললাম, কবিতা তো তেমন বুঝি না। তবে আপনার আবৃত্তিটা খুবই চমৎকার হয়েছে। শুনতে খুব ভালো লাগলো।

আপনার ভালো লাগার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু বলতে পারেন, এটা কার লেখা কবিতা?

আমি প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললাম, আপনার কথা মতো কবিতা শুনেছি। এবার অন্তত পরিচয়টা দিন।

এবার সে যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আপনি আমাকে চেনেন কিনা জানিনে, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি এবং জানি। আপনার সাথে আমার প্রায়ই কথা হয়।

আমি চমকে উঠলাম। হালকা রসিকতা করে বললাম, কি স্বপ্নের ভেতর?

সে বললো, হ্যাঁ। তবে শুধু স্বপ্নেই নয়। আপনার বই ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার লেখার মাধ্যমে। বলতে পারেন, আমি আপনার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত পাঠক। এবার সম্ভবত একটু চেষ্টা করলেই আমাকে চিনতে পারবেন। অবশ্য, অতীত যদি প্রতারণা না করে।

সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। এ সময় ফোনের ভেতর আরো দু'টো ক্রস লাইন এসে সবকিছু এলোমেলো করে দিল।

বাংলাদেশের টেলিফোনে সাধারণত যা ঘটে। ফলে তার কথা আর শেষ হলো না। ফোনটা রেখে আমি রুমের ভেতর হাঁটছি। এলোমেলো। সবই যেন কেমন ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, সে আবার ফোন করবে এবং এক্ষুণি।

www.pathagar.com

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলাম।

কিন্তু ও প্রান্ত থেকে আর কোনো ফোন এলো না।

চার

নিউ ইস্কাটনের রাস্তার ধারেই আমার অফিস।

অসুস্থ থাকার কারণে মাঝে তিনদিন অফিসে যেতে পারিনি। এ ক' দিনে আমি তার কথা ভেবেছি। বারবার ভেবেছি। ভেবেছি আর এক অজানা স্বপ্নে মাঝে মাঝে দুলে উঠেছি। শিহরিত হয়েছি। একটা রোমাঞ্চকর বাতাসে ভাসতে ভাসতে অন্য এক জগতে প্রবেশ করেছি। সেখানে দেখছি, দু' জন মানব-মানবী। কিছ বাঁশ কিছু খড় কিছু সুঁতালি দিয়ে আমরা একটি ঘর নির্মাণ করেছি। ছোট্ট ঘর। মাটির দাওয়ায় মাদুর বিছানো। মানবীর হাতে তালের পাখা। আমরা গল্প করছি বর্তমানের। গল্প করছি ভবিষ্যতের। রাত গভীর হচ্ছে। জ্যোৎস্না লাফিয়ে পড়ছে দাওয়ায়। দক্ষিণের বাতাসে আমি আরো আন্দোলিত হচ্ছি। মানবী হাই তুলে বলছে, আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে। চলো ঘুমুতে যাই। আমি বলছি, এই মাতাল করা জ্যোৎস্নায় ঘুম আসবে না। তার চেয়ে এসো, আমরা ভবিষ্যতের জন্যে একটি স্বপ্ন নির্মাণের প্রস্তুতি নিই। মানবী কপট ধমকের সাথে বলছে, এখন অনেক রাত, দুষ্টুমী রাখো তো! আমি বললাম, এ ভরা পূর্ণিমা, এ বসন্তের উত্তাল হাওয়া আর কবে পাবো, তার কি নিশ্চয়তা আছে? আমাদের প্রকৃতি কত নিষ্ঠুর তা কি তুমি জানো না? এসময়ে, অসহায়ভাবে মানবী তার শারীরিক অস্বস্তিকর অবস্থার কথা বললে আমি মন খারাপ করে উঠোনে হাঁটতে গেলাম।

পাঁচ

তিনদিন পর অফিসে গেলাম।

বেশ কাজের চাপ। আমি কাজে মগ্ন। হঠাৎ দরোজার পর্দা ভেদ করে একটি ছায়া আমার রুমে প্রবেশ করলো। আমি ঘাড় না তুলেই জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আমি।

কণ্ঠটি কোনো পুরুষের নয়। কোনো ছায়াও নয়। একটি মেয়ে।

হালকা-পাতলা গড়ন। গায়ের রং শ্যামলা। চুল ছোট করে ছাটা। মেয়েটি একটু বেঁটে। তবে মানানসই। পরনে সালোয়ার কামিজ। ওড়নার একটি অংশ মাথার ওপর দেয়া। মেয়েটির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললাম, বসুন। কোথা থেকে আসছেন?

www.pathagar.com

মেয়েটি আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে একটু খুক করে কাঁশলো। কাঁশির সাথে সামান্য-মৃদু হাসির রেখা তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো। আমি চেয়ার দেখিয়ে বললাম, প্লিজ বসুন।

মেয়েটি বসলো। তার চোখ দু'টো বেশ উজ্জ্বল। মুহূর্তেই সে আমাকে সম্ভবত পাঠ করে নিল। এ ব্যাপারে মেয়েরাই অবশ্য সব চেয়ে বেশি পারঙ্গম।

বললাম, কোথা থেকে আসছেন? বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

মেয়েটি এতক্ষণে কথা বললো, আমার জন্যে আপনার কিছুই করতে হবে না।

তার কণ্ঠটি শুনে বুঝলাম, এ মেয়েটিই ক' দিন যাবত ফোন করছে। স্বাভাবিক কারণেই আমার ভেতর আবেগ এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাকে প্রথম দেখার আনন্দ আমার হৃদয়-মনে অসম্ভব রকমের ঢেউ তুলছিল।

আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটি বললো, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমার বিষয় হলো, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক'। দু' মাস পর ফাইনাল পরীক্ষা। আর আমার নাম? বলেই সে হেসে উঠলো।

তার কথা বলার ভংগি এবং হাসিটা অত্যন্ত চমৎকার। সবকিছু জেনে-বুঝেও তাকে বললাম, আপনার নামটা কিন্তু এখনো বলেননি।

'আপনি' নয়। আমাকে 'তুমি' করে বললে খুশি হবো এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে। এবার নামটি বলতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?

মেয়েটি হঠাৎ একটু গম্ভীর এবং ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বেশভূষা তেমন কিছু না। খুব সাধারণ একটি মেয়ে। কোনো বাড়তি সাজসজ্জা নেই। তার ছোট করে ছাটা চুলগুলো একটু বিন্যস্ত করতে করতে মাথাটা উঁচু করে আবার নিচু করলো। কথা বলতে যেন তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। একটু সময় নিয়ে, চোখ দু'টো তার পায়ের পাতার দিকে রেখে প্রায় অস্ফুটে বলে উঠলো,

আমার নাম মুক্তা।

আমার সামনে মুক্তা বসে আছে। স্বপ্নের মতো মনে হলো। আমি তখন আর আমার ভেতর নেই। আমি তখন আর অফিসে কিংবা এ চেয়ারেও বসে নেই। আসলেই কি থাকা যায়? আমি মুক্তার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছি। তাকে দেখছি। তাকে পাঠ করার চেষ্টা করছি। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে সে বললো- কি, এবার চিনতে পারলেন তো?

আমি নিরুত্তর।

সে আবার বললো, যাকে নিয়ে এক সময় এত স্বপ্ন দেখেছেন, সে এখন আপনার সামনেই। দূরবর্তিনী ছায়ামানবীকে সামনে বসা দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন?

আমার মুখে কোনো ভাষা নেই। আমি নিরুত্তর।

www.pathagar.com

দীর্ঘ–অনেকগুলো বছর পার হয়ে যাবার পর, এভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটাকে আপনি বুঝি আশা করেননি?

আমি আবারও নিরুত্তর।

ছয়

আমার নীরবতা মুহূর্তেই দুমড়ে মুচড়ে আছড়ে পড়লো অদৃশ্য এক পিলারে। মুক্তা একটু আবেগজড়িত কণ্ঠে বললো, বাংলাদেশটা তেমন কিছু বড় নয়। ইচ্ছে করলে এখানে যে কোনো মানুষকেই খুঁজে বার করা যায়। তার প্রমাণ তো পেলেন। বলতে পারেন, এতদিন কেন আপনাকে খুঁজিনি। কেন যোগাযোগ রাখিনি। প্রশ্নটা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তার জবাব বা কৈফিয়ত আপনাকে এখন দেব না। দেয়াটা ঠিকও হবে না। তবে যোগাযোগ না রাখার অর্থ কিন্তু ভুলে যাওয়া নয়। বিশ্বাস করুন, একটি মুহূর্তের জন্যেও আপনাকে ভুলে থাকতে পারিনি।

বলতে বলতে মুক্তা বিষণ্ন হয়ে গেল। তার চোখে–মুখে নেমে এলো বৈশাখের ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, সাগর ভাই! আমি এবং আমার জীবন আপনার কাছে অনেক ঋণী। আপনার হৃদয়ের মূল্য দিতে আমি ব্যর্থ। তাই নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করে আজ এসেছি আপনার কাছে। এসেছি কিছু দিতে নয়, নিতে।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম।

সে বললো, দেবেন কি?

বললাম, কি?

মুক্তা প্রায় কাঁদোস্বরে বললো, ক্ষমা। আমাকে ক্ষমা করে দিন, সাগর ভাই! আমি হেরে গেলাম।

তার কথার অর্থ আমি বুঝতে না পেরে বললাম, আমার কাছে সবকিছু দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

মুক্তা আবার মাথা নিচু করলো। বললো, আসলেই তাই। আমিও কি জানতাম, আমার জীবনের এ পরিণতি হবে?

বললাম, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।

মুক্তা এবার ঘাড় তুলে আমার দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে বললো, ভেবেছিলাম জীবনটা আপনার সাথে মিলেমিশে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু পারলাম না। কারণ, এখনো সমাজে মেয়েদের ইচ্ছা–অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর

www.pathagar.com

তাই পরিবারের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতে হয়। বিশেষ করে আমার মতো ভদ্র, রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের।

আমার চোখে-মুখে অসংখ্য জিজ্ঞাসার জোনাকী।

মুক্তা বললো, দু' মাস পর আমার ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষার পর আমাকে আমেরিকা চলে যেতে হবে। সেখানে আমার একজন ভাই এবং মামারা থাকেন। আমার মামারা আমেরিকার সিটিজেনশীপ পেয়েছেন। তারা আমার ছবি পাঠাতে বলেছিলেন। পাঠিয়েছিলাম। তারপর কিছুদিন হলো, মামারা লিখেছেন-আমেরিকার একজন ব্যবসায়ী আমাকে বিয়ে করতে চান। ভদ্রলোক খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু আমাকে বিয়ে করার জন্যে তিনি মুসলমান হয়েছেন। মামারা তাঁকে কথা দিয়েছেন। বলুন, আমি এখন কি করতে পারি?

মুক্তার চোখ দু' টো ছলছল করে উঠলো।

তার কণ্ঠটাও ভারি হয়ে গেছে। এরপর হয়তো সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবে।

আমার সামনে মুক্তার চোখের পানি পড়বে। তার অশ্রুধারাকে আমি কিভাবে সহ্য করবো?

মুক্তা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে আর এগুতে না দিয়ে বললাম, মিস মুক্তা। আপনার মতো সৌভাগ্য ক' জন মেয়ের কপালে জোটে, বলুন! আমার আকস্মিক এই উচ্চারণে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিস্ফোরিত চোখে বললো, কি বললেন সাগর ভাই? আর একবার ওভাবে বলুন তো? 'আমি মিস মুক্তা'? আমাকে 'আপনি' বলে কথা বললেন?

নিজেকে সংযত করে বললাম, হ্যাঁ। আমার কিছু কথা আছে। আপনার স্বার্থেই তা শোনা প্রয়োজন।

মুক্তা আমার কথায় আহত হয়ে বললো, যিনি দীর্ঘদিনের পরিচয়কে অস্বীকার করতে পারেন, যিনি যাবতীয় সম্পর্ককে অবমাননা করে এমনভাবে কষ্ট দিয়ে উপেক্ষার সাথে কথা বলতে পারেন- থাক না, তার কথা শুনে আর কোনো কাজ নেই।

মনে মনে বললাম, না পাবার চেয়ে, পেয়ে হারাবার যন্ত্রণা এবং কষ্ট যে কত তীব্র তা কি তুমি বোঝো, মুক্তা! তোমাকে তো পেয়ে হারাতে পারবো না। তার চেয়ে তোমার কাছে না হয় মৃতই থাকলাম। তবু তোমাকে সত্যি সাগর হয়ে এভাবে বিদায় দিতে পারিনে। পারা যায় না।

আমি নিজেকে দ্রুত প্রস্তুত করে নিলাম। তাকে অনুরোধের সুরে বললাম, আসলে কথাগুলো খুবই জরুরি। আপনার শোনা দরকার। আপনাকে শুনতে হবে। তা না হলে একটা মারাত্মক ভুলের মধ্যে আপনি নিমজ্জিত হবেন। জেনে-বুঝে আমি এমন একটি সত্যকে চেপে যেতে পারিনে।

www.pathagar.com

মুক্তা বললো–কি সেই সত্য, বলুন।

দেখুন, আপনার যাবতীয় কথা শুনে, পরপর ক' দিন ফোনের আলাপ শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আসলে, আপনার হৃদয়ের কোনো তুলনা হয় না। কবিকে সবাই ভালোবাসতে চায়, কিন্তু কবির সাথে কেউ ঘর বাঁধতে চায় না। আপনি অনিবার্য অসুবিধায় না পড়লে তাও করতেন। আপনার মতো মহৎ হৃদয়ের মেয়ে সমাজে ক' জনইবা আছে? এত দীর্ঘ সময় ধরে কবিকে মনে রেখেছেন, ভালোবেসে এসেছেন– এর মূল্য অসীম। এর নজীর বিরল। তবু আপনার হিসাবে সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে।

ভুল? মুক্তা চমকে উঠলো।

হ্যাঁ, ভুলই বটে। আপনি যে ঠিকানায় এসেছেন– এটা নির্ভুল। যাকে চাচ্ছেন, সেটাও নির্ভুল। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। বিরাট পার্থক্য।

তার মানে?

তার মানে হলো, আমার নামও সাগর। অস্বীকার করছিনে। আর সেজন্যই তো গোলমালটা বেধে গেছে অনিচ্ছাকৃতভাবে। আমি একটু হাসবার চেষ্টা করলাম।

মুক্তা বললো, ভুলটা কোথায় হলো, সেটাই বলুন।

বললাম, আমার আগে এখানে, এই অফিসে যিনি চাকরি করতেন– তার নামও ছিল সাগর। তিনি ছিলেন কবি। আপনার প্রার্থিত সাগর তিনিই। আমি নিশ্চয়ই নই!

মুক্তা বিশ্বাস করলো কি করলো না– ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেমন শুষ্ক কণ্ঠে বললো, তিনি এখন কোথায়?

মুক্তার এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমার বেশ সময় লাগলো এবং অসম্ভব কষ্ট হলো। বললাম, তিনি শরীরের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করতেন। ফলে তার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন অসুস্থ অবস্থায় অফিস করেছিলেন। তারপর থেকে– তাও প্রায় মাস দু' য়েকের মতো হবে তিনি আর অফিসে আসছেন না। সম্ভবত তিনি ঢাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন।

মুক্তা বললো, তাকে কোথায় গেলে খোঁজ পেতে পারি?

আমার কাছে তখন আর একটি মাত্র জবাবই অবশিষ্ট ছিল। বললাম, অভিমানী কবি। বুকভরা যার অভিমান আর কষ্ট, তার খবর আমি কিভাবে দেব বলুন! তবু মনে হয়, তাকে আর পাবেন না।

www.pathagar.com

সাত

মুক্তার সামনে বসে থাকার মতো অবস্থা আমার আর ছিল না। সম্ভবত থাকতে পারে না। তাকে বসতে বলে আমি টয়লেটে ঢুকলাম।

টয়লেটে গিয়ে আয়নার সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছো– সাগর?

সাগরের ভেতর থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো। কণ্ঠটি বেদনাহত হলেও স্পষ্ট, না পাবার চেয়ে, পেয়ে হারাবার যন্ত্রণা এবং কষ্ট অনেক বেশি।

আট

টয়লেট থেকে হাতে–মুখে পানি দিয়ে বার হয়ে রুমে এসে দেখি, মুক্তা নেই। শূন্য চেয়ারটিতে কোনো মানুষ বসে নেই। কেউ নেই। তবু যেন কোনো এক অস্তিত্বের ভারবাহী হাওয়া রুমের ভেতর উথাল–পাতাল ঢেউ তুলছে। আর সেই হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে আশ্চর্য রকমের, সম্পূর্ণ নতুন, ভিন্ন ধরনের একটি গন্ধ। গন্ধটি না পারফিউমের। না ফুলের।

নয়

আমি অফিস রুমে পায়চারি করতে করতে গন্ধটিকে বুকের ভেতর টেনে নেবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ আমার পেছন থেকে গুমরে ওঠা, বুকফাঁটা এক কান্নার আওয়াজে সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরালাম। চেয়ে দেখি, আমার টেবিলের সামনের চেয়ারে একটি ছায়ামানবী বসে আছে। ঠিক মুক্তার মতো। তার দিকে এগিয়ে বললাম, মুক্তা তুমি কাঁদছো? আমি মুক্তার মাথায় সান্ত্বনার হাত রাখতে গিয়ে দেখি, মুক্তা নেই।

আমার হাতটি শূন্যের মথিত মাস্তুলে অনড় পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে।

সচিত্র বাংলাদেশ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৪০০; ১৫ মে ১৯৯৩

www.pathagar.com

পর্বত এবং প্রতিকৃতি

লোকটি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাঁটছিল। একাকী। খুব দ্রুত। হাঁটছিল এবং বারবার পেছনে তাকাচ্ছিল। একটি অশরীরি ছায়া লোকটিকে অনুসরণ করছিল।

হাঁটতে হাঁটতে লোকটি বিস্তীর্ণ এক মাঠের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়ালো। চারদিকে খোলা প্রান্তর। মাঝখানে বিরাট-বিশাল এক বটগাছ। বটের শাখা-প্রশাখায় লেপ্টে আছে ভয়ংকর দৃশ্য। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত। নির্জন প্রান্তরে লোকটি একা দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে দূরের লোকালয় থেকে কুকুরের চিৎকার ভেসে আসছে। কুকুরের চিৎকারধ্বনি বটগাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে সেখান থেকে এক ধরনের ভৌতিক শব্দ কেঁপে কেঁপে উঠছে। শব্দটি প্রলম্বিত হয়ে লোকটিকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। বাতাসও ভয়ে শিউরে উঠছে।

বটতলায় দাঁড়িয়ে লোকটি কি যেন ভাবলো। তারপর অন্ধকারের ভেতর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ টেনে বার করলো। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। নিজের চেহারাও ঝাপসা, অস্পষ্ট। লোকটি তবু কাগজের টুকরোটি অন্ধকারে মেলে ধরলো এবং সেটা পড়বার চেষ্টা করলো।

তাহলে কি অন্ধকারেরও কোনো দীপ্তি আছে?

অনুসরণকারী ছায়াটি অদূরে দাঁড়িয়ে ভাবলো এবং লোকটির প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলো।

দুই

কাগজে কয়েকটি ফোন নম্বর লেখা আছে। নিচে আছে আরো জরুরি কয়েকটি লাইন। যেমনঃ

ক. আমি যদি সকাল নয়টা থেকে পাঁচটার মধ্যে মারা যাই, তাহলে ২৩৩২৯৪, ২৩৯৮৬৩ অথবা ৫০০৩৩২ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

খ. যদি রাত ১২টার পরে এবং ভোর পাঁচটার আগে মারা যাই, তাহলে ৪১৯৬৬৯ অথবা ৪১৪৪৫০ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

www.pathagar.com

গ. যদি ঢাকার বাইরে মারা যাই, তাহলে ৬২১৯৫ অথবা ৫০১০ ফোন নম্বরে খবর দেবেন।

ঘ. আমি মুসলমান। সুতরাং ইসলামী নিয়ম মোতাবেক আমার দাফনের ব্যবস্থা করবেন।

ঙ. আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। তবে আমার বাম পকেটের ডায়েরিটা পড়ে দেখতে পারেন। কিন্তু 'সাধারণের পড়া নিষেধ' অংশটি কেউ পড়বেন না। কেননা, এখানে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু স্মৃতি, কিছু প্রেম, কিছু বেদনা, কিছু ভালোবাসার কথা লেখা আছে। আমার মৃত্যুর সাথে সে সবের কোনো সম্পর্ক নেই।

তিন

ডায়েরিটা পকেট ডায়েরি। দিনপঞ্জীর মতো করে এতে কিছু লেখা নেই। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় দু' চার লাইন করে লেখা। তারও কোনো ধারাবাহিকতা নেই। অধিকাংশ লাইন সাংকেতিক। সে সব লাইনে তার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ব্যক্তির নাম লেখা আছে। তাদের সাথে লোকটির সম্পর্ক এবং তাদের চরিত্রের কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ডায়েরির শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠার লেখা বেশ দীর্ঘ এবং বিস্তারিত। প্রথম থেকে ডায়েরির লেখাগুলো এরকমঃ

ক. ১৯৭০-৭৫ ঃ শুয়োরের খোয়াড়ে বন্দী।

খ. ১৯৭৬-৮৪ ঃ জীবন যুদ্ধের ছাত্র।

গ. ১৯৮৫ ঃ যান্ত্রিক জীবনে পদার্পণ।

ঘ. ১৯৮৬-৯২ ঃ পাথর সময়।....

বিস্তারিত লেখাগুলো যে খুব পরিপাটিভাবে সাজানো, তাও নয়। তবে লেখার পাশে এবং কিছু কিছু লাইনের নিচে লাল কালিতে দাগ দেয়া আছে। যাতে প্রমাণ করে লাইনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'পাথর সময়' অংশে কয়েকটি পৃষ্ঠার লেখা এরকমঃ

আমি জুলুম নির্যাতন এবং অসম্ভব ষড়যন্ত্রের শিকার। অসহনীয় গ্লানি আর অপমান নিয়ে আমার প্রতিদিন জীবন যাপন। এতদিন যাদেরকে বন্ধু বলে ভেবেছি, আপন বলে জেনেছি- তারাই আমার ক্ষতি সাধনে উন্মুখ। তাদের চোখে-মুখে হিংসা ও ঈর্ষার বারুদ। আমার কর্মস্থলেও সেই বারুদের গন্ধ। চারদিকে ধ্বংসের ঘন্টাধ্বনি। প্রতিটি মুহূর্ত অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমার চারদিকে বিষধর অজগর। তাদের ভয়াল ফনা আমার দিকে লক লক করছে। আমার অপরাধ– আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। বেড়ে উঠতে চাই। একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে তোয়াজ কিংবা তোয়াক্কা করিনে। অথচ সবাই তা করে। সবাই এসব পছন্দও করে। মোসাহেবি করে আমার বন্ধুরা ক্রমাগত ওপরে উঠে যাচ্ছে। আমি করছিনে এবং তাদের মোসাহেবিটাও পছন্দ করছিনে। এটা তাদের কাছে মারাত্মক অপরাধ। তারা মনে করে, আমরা আজন্ম গোলাম। কিন্তু আমি সেটা মনে করিনে। আমি মনে করি, আমার জন্ম হয়েছে স্বাধীনতার সূর্যালো মেখে এবং স্বাধীন ভূমিতে। আমার শরীরে কোনো গোলামের রক্ত নেই। আমি কেন আমার দাসখত লিখে দেব? আমি কেন দাসের মতো জীবন যাপন করবো?

আমার 'নিজের মতো করে' বেড়ে উঠতে চাওয়াটা কেউ পছন্দ করে না। আমার মতো প্রতিবাদী স্বাধীনচেতা মানুষগুলোর জীবনের পরিণতি বোধকরি আমার মতোই গ্লানিকর। চারদিকে হিংসা বিদ্বেষ আর আগুনের থাবা। তারা আমাকে সহ্য করতে পারছে না। আমার জীবন যাপনের জানালায় পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। দরোজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং চলার পথে কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছে।

নির্বান্ধব এই শহরে বিষের ফনার মধ্যে কিভাবে বেঁচে থাকবো?

আমার মৃত্যুর কারণ–আমার বন্ধু এবং স্বজনরাই। যাদের সাথে দীর্ঘকাল অবস্থান করছি।

আমার মৃত্যুর কারণ–আমার কর্মক্ষেত্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। কারণ, এরাই আমাকে দুঃসহ জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এরাই আমাকে মৃত্যুর দিকে তিলে তিলে ধাবিত করেছে।

আমার মৃত্যুর কারণ–এদের কাছে বিস্তারিত জানা যাবে। হয়তোবা তারা আমার মৃত্যুতে ব্যথিত হবে না। কিন্তু লোক দেখানোর জন্যে শোকসভা করবে। আমার অনুরোধ, আমার লাশের গায়ে যেন এসব তুখোড় শকুনেরা হাত না দেয়। কোনো গোলামের বাচ্চা যেন আমার লাশ স্পর্শ কিংবা বহন না করে।

আমার শেষ ইচ্ছা, আমার লাশ নিয়ে এসব ধূরন্ধর শিয়াল যেন উপহাস করতে না পারে।

আহ্ মৃত্যু! মৃত্যু কি এক ভয়ংকর শীতল পর্বত!

www.pathagar.com

চার

মধ্যরাত ছাড়িয়ে গেছে। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে লোকটিকে ঘিরে ধরেছে। সম্মুখে বিশাল বটগাছ পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে। কেয়ামতের মতো ভয়ংকর দৃশ্য। নিজের নিঃশ্বাসও ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

নির্জন মাঠের মধ্যে লোকটি একাকী দাঁড়িয়ে। সে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও কাগজটি পড়ে দেখলো লেখাগুলো নির্ভুল হয়েছে কিনা। পড়া শেষ করে প্রচন্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে রাখলো। কয়েকবার মাথা তুলে বটগাছের দিকে তাকালো। এত গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে আকাশ দেখা সম্ভব নয়। সম্ভবত লোকটি বটগাছের দিকে এগুনোর সময় কিছু একটা ভাবছিল।

ভাবছিল, মৃত্যুর আগে একবার কাঁদলে কেমন হয়? তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। মাত্র একবার এবং শেষবার।

কিন্তু সে কাঁদলো না।

হয়তোবা নিজেকে সে প্রশ্ন করলো, কেন কাঁদবো? কার জন্যে? পরাজিতরাই কেবল কাঁদে। আমি তো পরাজিত হতে চাইনে।

লোকটির আমৃত্যু আত্মবিশ্বাস দেখে অনুসরণকারী ছায়াটি বিস্মিত হলো এবং হেসে উঠলো।

লোকটি এগুচ্ছে। বটগাছের দিকে। অন্ধকার ভেদ করে। এক পা–দু' পা করে এগুচ্ছে। হঠাৎ কোনো এক দৈবটানে লোকটি মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। বৃষ্টির মৌসুম। কাদা পানিতে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে মাটি। লোকটির শরীরে কাদামাটি লেগে গেছে। অস্ফুটে সে বললো, আহ্!

অন্ধকার ভেদ করে একটি শব্দ ভেসে এলো। লোকটি বললো,

কে?

আমি। আমি মৃত্তিকা।

তুমি এখানে? কি বলতে চাও?

এভাবে তুমি মরতে পার না।

কেন?

পরাজিতরাই কেবল কাপুরুষের মতো মরে।

আমার দিকে তাকাও। আমি মৃত্তিকা। কেবল তোমার জন্যেই আমি প্রশস্ত হয়ে গেছি।

লোকটি দু'হাতে মৃত্তিকার দেহ তুলে অবাক বিস্ময়ে বললো– সে কি, তুমি কাঁদছো? তোমার চোখে পানি!

www.pathagar.com

হ্যাঁ। আমি কাঁদছি। কারণ, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি। মানুষ তোমাকে হিংসার আগুনে পুড়িয়েছে। তোমার মৃত্যুর জন্যে কামনা করেছে। জুলুম নির্যাতন আর লাঞ্ছনার বিষে তোমাকে জর্জরিত করেছে। করেছে এজন্যে যে, তারা তোমাকে ভয় পায়। তোমাকে ভয় পায়–কারণ, তুমি পর্বতের মতো অবিচল। তারা ভয় পায়–কারণ, তোমার ভেতর বিদ্রোহের আগুন, বজ্রের তোলপাড়। সুতরাং কাপুরুষের মতো এভাবে তুমি মরতে পারো না। তুমি পরাজিত হলে আমার যে লজ্জার সীমা থাকে না!

মৃত্তিকার বুকে মুখ রেখে লোকটি বললো, মৃত্তিকা!

মৃত্তিকা বললো, হ্যাঁ। আমি মৃত্তিকা। আমি পৃথিবী। প্রয়োজনে আমি তোমার জন্যে আরো প্রশস্ত হয়ে যাবো। পৃথিবী তো আর বিন্দুর ওপর ভাসমান নয়। তুমি আমার ভেতর প্রবেশ করো। আমি তোমার জন্যে অমরতার ফুল ফোটাবো। অসীম সাহসের বৃষ্টিতে তোমার যাবতীয় কষ্ট ও গ্লানির ক্ষত মুছে দেব। তোমাকে পরিশুদ্ধ এবং পরিপূর্ণ করে তুলবো। প্রকৃতির নির্মল বাতাসে তুমি বেড়ে উঠবে। তুমি বেড়ে উঠবে স্বাধীনভাবে। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে অজেয় পর্বত।

পাঁচ

মৃত্তিকার আহ্বানে লোকটি চোখ খুললো। ঊর্ধে তাকালো। আকাশের নক্ষত্ররাজি তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মাথার ওপর কে যেন হাত রাখলো। লোকটি শিহরিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে?

আমি– আমি ছায়ার প্রতীক। অশরীরি সাহসের কন্যা। আমাকে প্রগাঢ়ভাবে স্পর্শ করো। তারপর প্রবল হাসির ঢেউ তুলে বললো– তুমি হয়তো জানো না যে, মরা খুবই সহজ কিন্তু অমর হওয়া কঠিন। ইচ্ছা এবং সাধনা থাকলে সেটাও সম্ভব হয়। আর সেটা তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষ দুর্বার এবং অজেয় হতে পারে। তুমি তো সহজ পথেই যেতে চেয়েছিলে মৃত্যুর বাড়ি। পেরেছো? পারনি। পারবেও না। কারণ, তোমার জন্যে এখনো কিছু প্রেম, কিছু ভালোবাসা এবং কিছু স্বপ্ন অবশিষ্ট আছে। আর প্রকৃত প্রেম এবং স্বপ্ন কখনো আত্মাহুতিতে কাউকে মরতে দেয় না। প্রেমই বরং মানুষকে অমরত্ব দান করে।

www.pathagar.com

ছয়

হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো।

বিদ্যুতের ফলায় অন্ধকারের জানালা গলিয়ে এক পশলা আলো পৃথিবীতে ছিটকে পড়লো। পৃথিবী আলোকিত হলো। প্রকৃতির নাক থেকে প্রবাহিত হলো বিশুদ্ধ হাওয়া। লোকটি মুঠো মুঠো হাওয়ার পরাগ টেনে নিল বুকের ভেতর।

লোকটি শীতল হলো।

ছায়াটি অন্ধকারের খিড়কি খুলে তার ভেতর প্রবেশ করতে করতে বললো, এই তো এখন বেঁচে আছো। আমিও তো প্রেম ও ভালোবাসার পশরা নিয়ে তোমার ভেতর আছি। বুকে হাত রেখে এবার বলো তো, এখন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে কিনা?

অশরীরি ছায়াটি আদর সোহাগে লোকটিকে পরিপূর্ণ করে তুললো। তারপর অন্তহীন স্বপ্নের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে বললো–এবার সত্যি করে বলো তো, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য কি? বলো তো–কোন্‌টাতে বেশি আনন্দিত হয় মানুষ? কোন্‌টি অধিক মূল্যবান?

লোকটি কোনো জবাব দিল না। সে নীরবে–নিঃশব্দে মৃত্তিকার বুকের ওপর পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে গেল। ছায়াটির শাড়ির আঁচল এবং অবিন্যস্ত ঘন–কালো দীর্ঘ চুলের ডগায় লোকটি ব্যর্থতার গ্লানি মুছে একধরনের অপার্থিব সুবাস নিয়ে তারা দু' জনে পুনরায় দিগন্তের রাস্তা ধরে যাত্রা শুরু করলো।

পুনশ্চ

মৃত্যুর দরোজা থেকে ফিরে আসা মানুষের অভিজ্ঞতা জানার জন্যে কয়েকজন সাংবাদিক লোকটিকে ঘিরে ধরলো। সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকার দিতে বললে লোকটি মুচকি হেসে অকস্মাৎ ভিড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

একজন ফটো সাংবাদিক লোকটির ছবি তুলেছিল। ছবিটি ওয়াশ করতে গিয়ে দেখা গেল, হাস্যোজ্জ্বল ভংগিতে পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছে লোকটি এবং তার শরীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপা–সুন্দরীর বিশাল প্রতিকৃতি।

অঙ্গীকার ডাইজেস্ট, নভেম্বর ১৯৯২

www.pathagar.com

দৃশ্যান্তর

দৃশ্য সংকেত

বহু পুরনো একটি ভাঙা টিনের ঘর। কাঠের তৈরি পাটাতন। কাঠগুলো নড়বড়ে। একটু চাপ লাগলেই ভেঙে পড়ার আশংকা। একটিমাত্র জানালা। জানালার শিক নেই। শহরের পিঠের ওপর একটি নিভৃত গলিতে তিন শো ছাব্বিশ নম্বর এই ঘরটিতে সে আছে দীর্ঘ আট বছর।

শীতকাল। শীতের তীব্রতা প্রবল। তার ওপর সকালে আবার বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির সাথে হালকা বাতাস। বৃষ্টির কারণে শীতের মাত্রাটা আরো বেড়ে গেছে।

দু'দিন থেকে রমিজের জ্বর। এ বাসায় সে একা থাকে। একাই শুয়েছিল কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

জানালাটা খুলে দিয়ে রমিজ বাইরের দিকে তাকায়। আকাশটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কবুতরের ডানার মতো সাদা সাদা মেঘ। মেঘগুলো উড়ে যাচ্ছে। দূরে– বহু দূরে। অদৃশ্যে।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ট্রেনের হুইসেলের মতো মাঝে মাঝে তার বুকের ভেতর কেমন একটা বিকট শব্দ বেজে বেজে উঠছে। ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপরও রমিজের ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ রকমের ঘুম।

ঘুমের ভেতর প্রথম দৃশ্য

পাঁচ বছর আগে বিয়ে করেছিল রমিজ। কিন্তু তার বেশিদিন ঘর করা হয়নি। কোথা থেকে একটি প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় এসে তার সুখের ঘরটি ঝরাপাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল। স্বপ্নগুলো কাঁচের পাত্রের মতো ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। একসময় সেসব ভগ্নাংশের ছায়াগুলিও রমিজের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রমিজের স্ত্রী শরিফা যখন মারা গেল, তখন সে ছিল চার মাসের গর্ভবতী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

শরিফার সন্তানটি যেন মরেনি। সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এই মুহূর্তে। পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে। কোনো না কোনো ঘরে। অদৃশ্যের দু'জন নারী এসে সন্তানটিকে পৃথিবীতে টেনে বার করে এনেছে। বাঁশের চটি তুলে তার নাভী কাটছে। তাদের পরনে কাফনের মতো সাদা শাড়ী। হাতের কব্জি পর্যন্ত লম্বা সাদা ব্লাউজ। তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। একজন বলছে, বাচ্চাটি মেয়ে। অন্যজন বলছে– না, ছেলে।

ছেলে না মেয়ে– এ নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক হচ্ছে। এসময় আর একজন বৃদ্ধা সেখানে এলো। তার পরনেও সাদা শাড়ি ও সাদা ব্লাউজ। সে দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে বললো– আহা, এখন তর্কের সময় নয়। দেখছো না বাচ্চাটির মুখ শুকিয়ে গেছে! ওর মুখে একটু দুধ অথবা মধু দাও।

যুবতী দু'জন মধু এবং দুধের সন্ধানে বার হলো। হা হতোস্মি। এমন দিনে বাচ্চাটি জন্মালো, যেদিন তার জন্যে পৃথিবীতে একবিন্দু দুধ এবং মধু উৎপন্ন হয়নি। তারা নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। হতাশ হয়ে তারা সবাই বাচ্চাটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চাটি তখনো হাসছে। তারা বিস্মিত হয়ে সমস্বরে বললো, দেখো তো কি কান্ড! বাচ্চা যে হাসে। ভূমিষ্ঠ হয়েই তো কাঁদতে হয়। তুমিও কাঁদো। হ্যাঁ, অন্তত একবার কাঁদো তো সোনামণি!

তাদের কথা শুনে সদ্যজাত শিশুটি আরো জোরে চিৎকার করে হেসে উঠলো। তার হাসিতে পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠলো। কেঁপে উঠলো ভয়ে, শংকায়, লজ্জায় এবং আত্মগ্লানিতে।

তিনজন নারী অনুনয়ের সাথে বললো–এমনটি করে না বাছা! জন্মালেই তো কাঁদতে হয়। বড় হয়ে তো কতবার কাঁদতে হবে। এখন একবার একটু কাঁদো তো!

আর একবার হাসির ঝড় তুলে নবজাত শিশুটি বললো, আমি তো কাঁদতে আসিনি। কাঁদতে জানিনে।

তৃতীয় দৃশ্য

শরিফা প্রসব বেদনায় কাতর ছিল। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার সময় সে সংজ্ঞাহীন ছিল। অনেকক্ষণ পর চোখ খুললো। চোখ মেলেই তার পাশে সদ্যজাত বাচ্চাটিকে দেখলো। দেখে পরিতৃপ্তির সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। শরিফা চোখ খুলতেই তিনজন অদৃশ্যের নারী

www.pathagar.com

অদৃশ্যে হারিয়ে গেল। মেঘের ওপর থেকে কে যেন বললো, তোমার শিশুটি একাকীই বড় হবে। তুমিও ওপরে উঠে এসো শরিফা!

শরিফার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। তবু তার কণ্ঠ দিয়ে কান্নার শব্দ ফুটছিল না। কেবল তার দু' চোখ বেয়ে করুণ ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। একসময় তার চোখ দু' টো স্থির হয়ে গেল। তারপর থেকে শরিফার সেই স্থির দু' টো চোখে কেবলই জমে উঠেছে প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা এবং প্রতীক্ষা।

দৃশ্যের ভেতর ছায়াদৃশ্য

পৃথিবীতে যুদ্ধ, রক্ত, খুন, মহামারী চলছে। প্রতিটি দেশেই অসহ্য বিষবাষ্পে আবহাওয়া দুষিত হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে শিশুটি বেড়ে উঠছে। বেড়ে উঠছে প্রতিহিংসার উপত্যকা পেরিয়ে, ক্রোধের পর্বত নিয়ে। তার হৃদয়ে দাউ দাউ আগুন। চোখের ভেতর সাতটি আগ্নেয়গিরি। আবার হৃদয়ে মানবতা ও মমতার পাঁচটি মহাসাগর। শিশুটি বেড়ে উঠছে। বাড়তে বাড়তে সে মহাদেশের মতো বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। মহাদেশগুলো ছাড়িয়ে অন্য-অনাবিষ্কৃত মহাদেশের বুকে পড়ে তার ডান পা। বাম পা পৃথিবীর বাইরে। মাথাটি সাতটি আকাশ ছাড়িয়ে আরো ওপরে উঠে গেছে। তার দু' বাহুর একটিতে যুদ্ধের নীল নকশা। অপরটিতে শান্তির প্ল্যাকার্ড।

অদৃশ্যের তিনজন নারী নেমে এলো পৃথিবীতে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি হে বাছা! কোন্ নামে তুমি পরিচিত?

তাদের কথা শুনে পরপর শিশুটি দু' টো হাই তুললো। প্রথম নিঃশ্বাসে সাতটি দোজখের উত্তাপ বেরিয়ে এলো। দ্বিতীয় নিঃশ্বাসে নেমে এলো আটটি বেহেশতের কোমল প্রশান্তি। বললো,

আমার নাম? আমার নাম- মানুষ। আমি এলে পৃথিবী প্রশান্ত হয়। আমি তাই বারবার আসি। আমি আসবো। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে- কোনো না কোনো ঘরে। আমি তো প্রকৃতির মতো পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করি, তাই সকল নিষেধ অমান্য করে আমাকে আসতেই হয়। আমি আসছি এবং আসতেই থাকবো।

দৃশ্যের বাইরে

জানালা দিয়ে প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস আসছে। একটা মাত্র কাঁথায় শীত মানছে না। রমিজ শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার ঘুম ভেঙে গেল। দক্ষিণের আকাশ তার দু' চোখব্যাপী

www.pathagar.com

ঝাপসা হয়ে এলো। বঙ্গোপসাগর বুঝি এইমাত্র আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে জেগে উঠলো। কাঁথাটি গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে রমিজ ঘুমের ভেতর দেখা শিশুটির কথা ভাবতে লাগলো। সত্যিই কি শিশুটি জন্ম নিচ্ছে?

কোথাও যেন কামানের শব্দ হলো। তবে কি আবারো যুদ্ধ বেঁধে গেল! এদেশে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে? নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এ মুহূর্তে যুদ্ধ চলছে। রমিজ স্বপ্নে দেখা শিশুটির আগমনের প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে উঠলো।

অদৃশ্য থেকে শব্দ ভেসে এলো, আসবে। নিশ্চয়ই আসবে সে। আজ অথবা কাল। দু' হাজার অথবা তিন হাজার সাল। যে কোনো মুহূর্তে, পৃথিবীর যে কোনো ঘরে। অশান্ত পৃথিবীকে প্রশান্ত করতে হলে এমন শিশুর জন্মতো অবশ্যম্ভাবী! তাকে তো আসতেই হবে। হয়তোবা এতক্ষণে সে এসেই গেছে ।

শিশুটির পতীক্ষায় এক, দুই, তিন করে রমিজ গুণতে থাকলো। অবশেষে সে আর গুণতে পারলো না। ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য দুর্বার দূরন্ত পাখি তার সম্মুখ দিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। দূরে– বহু দূরে। আকাশের সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্যে।

অঙ্গীকার ডাইজেস্ট, ঈদ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৩

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খান–অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত এক শক্তিশালী আধুনিক মৌলিক কবি। কবিতার মতো গল্প তথা কথা সাহিত্যেও কবি খান সমান দক্ষ। তাঁর গল্পে–স্বপ্ন, প্রেম, দ্রোহ, কালের নির্মম–নিষ্ঠুরতা এবং জীবন ও প্রকৃতির আবেগঘন রহস্য বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। যে গল্প কখনো পুরনো হয় না, বরং রসজ্ঞ পাঠকের মেধা এবং মননে যে গল্পের ধ্বনি বার বার গুঞ্জরিত হতে থাকে। গল্পের বিষয়–বৈচিত্র্য, ভাষা ও উপস্থাপন কৌশলেও রয়েছে তাঁর কবিসুলভ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আর তাঁর গদ্যভাষায় আছে এমন এক মায়াবী যাদুর স্পর্শ–যা পাঠককে এনে দেয় গল্প পাঠের পরিতৃপ্তির এক পরিপূর্ণ আরাম। এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবার প্রকাশিত হলো কবি খানের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ–'সময় ও সাম্পান।' 'সময় ও সাম্পানে' রয়েছে জীবন ঘনিষ্ঠতার পাশাপাশি গল্পের নতুন পরীক্ষা–নিরীক্ষা, পরাবাস্তবতা, আন্তর্জাতিকতা ও বৈশ্বিক দৃষ্টি ভংগির এক অসামান্য স্বাক্ষর। এই গল্পগুচ্ছেও কবি খান–তাঁর যাদুকরী ভাষা এবং বিষয় বৈচিত্র্যে খুলে দিয়েছেন একের পর এক আশ্চর্য দরোজা। যে কোনো পাঠককে আন্দোলিত এবং আলোড়িত করার মতো আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে সংযোজিত হলো কবি মোশাররফ হোসেন খানের আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি–

সময় ও সাম্পান